

বহিপীর

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

[হেমন্তের বেলা নয়টা। পানির শব্দ, দূরে জাহাজের সিটি-ধ্বনি, তীরে ফেরিওয়ালার হাঁকাহাঁকি, ভাটিয়ালি পানের অতি ক্ষীণ রেশ ইত্যাদির সমবেত কোলাহলের মধ্যে পর্দা উঠলে দেখা যাবে মঞ্চের অধিকাংশ স্থানজুড়ে দু-কামরাওয়ালা একটি রঙদার বজরা। কোণে সামান্য উঁচু পাড়, বজরা থেকে সে পাড়ে যাতায়াতের জন্য একটা সিঁড়ি। দর্শকের দিকে বজরাটি খোলা। পেছনে জানালাজুলোর অধিকাংশ তোলা, যার ভেতর দিয়ে অপর পারের আভাসও কিছুটা দেখা যাবে। বজরার সামনে পাটাতনে বসে একটি চাকর মসলা পেঁষে; একটু দূরে একজন মাঝি আপন মনে দড়ি পাকায়। তারই কাছাকাছি বসে হকিকুল্লাহ হুঁকা টানে। ছাদে শুকায় একটি রঙিন আলখাল্লা ও পায়জামা।

বড় কামরায় হাতেম আলি চাদরে আধা-শরীর ঢেকে বহিপীরের সঙ্গে কথোপকথন করেন। তাঁর বয়স পঞ্চাশের মতো, মুখে চিত্তার ছাপ। কথা বলতে বলতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। বহিপীরের বয়স কিছু বেশি কিন্তু মজবুত শরীর। মুখে আধা-পাকা দাড়ি, মাথায় চুল ছোট করে ছাঁটা।

পাশের ঘরে হাতেম আলির ছেলে হাশেম আলি মোড়ায় বসে বসে তার মা খোদেজা ও তাহেরার তরকারি কোটা দেখে। হাশেম আলি যুবক মানুষ; অস্থির মতি ও একটুতে রেগে ওঠার অভ্যাস। কখনো সে পায়চারি করে, কখনো বসে, কখনো বা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে জানালার ধারে বিছানা পাতা বেক্সির ওপর।

তাহেরার বয়স অল্প; মুখে সামান্য উদ্ভ্রান্ত ভাব। সেটা অবশ্য সব সময়ে পরিলক্ষিত হয় না।

সারা সকাল খোদেজা আর তাহেরা রান্নাবান্নার কাজ করবে। বাইরে যে চাকরটিকে মসলা পিষতে দেখা যাবে, সে থেকে থেকে আসবে যাবে এটা-সেটা নিয়ে।

পর্দা ওঠার পর হাতেম ও বহিপীরের আলাপ করতে দেখা যাবে বটে, কিন্তু তার আওয়াজ শোনা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত পাশের ঘরে হাশেম আলি ও খোদেজার কথাবার্তা শেষ না হয়। দুই কামরার মধ্যে দরজাটি বন্ধ।

হাশেম — কী ঝড়ই হলো শেষ রাতে! এমন ঝড় কখনো দেখিনি। সময়মতো খালের ভেতর ঢুকতে না পারলে কে জানে কী হতো। (তাহেরার দিকে তাকিয়ে) আপনি ভয় পেয়েছিলেন কী?

তাহেরা — (মাথা নাড়ে কেবল)

খোদেজা — যে মেয়ে ঘর ছেড়ে পালাতে পারে, সে অত সহজে ভয় পায় না। কিন্তু আমি এ কথা বুঝি না যে তুমি কী করে পালাতে পারলে। কথাটা যেন বিশ্বাস হতে চায় না। কে কখন এমন কথা শুনেছে? (একটু থেমে) পালাবার সময় সত্যিই এ কথা খেয়াল হরনি যে কোথায় যাব কোথায় থাকব কী করে এমন কাজ করি?

তাহেরা — (আবার মাথা নাড়ে)

খোদেজা — (কাজ করতে করতে) কাল ডেমরার ঘাটে আমরা যদি বজরা না থামাতাম আর বিপদে পড়েছি দেখে তোমাকে যদি তুলে না নিতাম, তবে কোথায় থাকতে এখন, যেতেই বা কোথায়? (উত্তর না পেয়ে) হঠাৎ দেখি তীরে ভিড়। একটা ছেলে কাঁদছে, পাশে অল্প বয়স্কা একটি মেয়ে চুপচাপ বসে আছে। চাকরটা এসে বলল, একটি মুসলমান মেয়ে বিপদে পড়েছে।

সঙ্গে একটি ছেলে, সেও ডাকচিৎকার পেড়ে কাঁদছে। তাদের নাকি কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই? জানেও না কোথায় যাচ্ছে। শুনে ভিড় জমে গেছে, বদলোকেরা তোমাকে চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছে, এক-আধটু ঠাট্টা-মস্করা করতেও শুরু করেছে। (থেমে) কথাটা একবার ভেবে দ্যাখ; আমি তোমাকে ডেকে না পাঠালে কী হতো তোমার?

- তাহেরা — (সামান্য হেসে) অত ভাবলে কি কেউ পালাতে পারে?
- হাশেম — ছেপেটি কে ছিল?
- তাহেরা — চাচাতো ভাই।
- খোদেজা — তার কথা সে বলেছে আমাকে। অল্প বয়সের ছেলে, না বুঝে না শুনে ওর কথায় পালাবার সাথী হয়েছিল। কিন্তু ডেমরায় পৌঁছে ছেলেটার হঠাৎ হুঁশ হলো; এ কী সে করছে। তখন বলে, পুলিশ এলো, এসে ধরল তাদের। তা ছাড়া ক্ষিধাও পেয়েছে অথচ পয়সা নাই কারও কাছে। ভয়ে আর ক্ষিধায় কাঁদতে লাগল ছেলেটা। (তাহেরাকে) অথচ তুমি মেয়ে হয়েও তোমার চোখে না ছিল ভয়, না ছিল কান্না, শাবাশ মেয়ে তুমি। এমন মেয়েও কারও পেটে জন্মায়, জানতাম না।
- তাহেরা — (হেসে) আপনার তো বুড়োর কাছে বিয়ে হয়নি, আপনি কী করে বুঝলেন কেন বা কী করে পালিয়েছি?
- খোদেজা — (বিস্ময়ে) কথা শোনো! বুড়োর কাছে বিয়ে হলোই এমন করে পালায় নাকি কেউ? বিয়ে হলো তকদিরের কথা। কারও ভালো দুলা জোটে, কারও জোটে না, কেউ স্বাস্থ্য, সম্পদ সবাই পায়, কেউ পায় না। তাই বলে পালাতে হয় নাকি? ওটা কত বড় গুনাহু তা বোঝো না?
- তাহেরা — (মুচকি হেসে, উত্তর না দিয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে) নদীতে খালি কচুরিপানা। নদীতে বেগুনি রঙের শাপলা থাকে না, পদ্ম-পলাশ থাকে না। খালি কচুরিপানা, কেবল কচুরিপানা ভেসে যায়।
- খোদেজা — না, মেয়েটির চিন্তাভাবনা নাই। সুখেই আছে।
- হাশেম — বাড়িতে কে আছে আপনার?
- তাহেরা — (একনজর হাশেমের দিকে তাকিয়ে) বাপজান আর সৎমা। যে বুড়ো পীরের সঙ্গে বাপজান আমাকে বিয়ে দিলেন, আমরা তাঁর মুরিদ। অবশ্য আমি না, আমার বাপজান ও সৎমাই তাঁর মুরিদ। বছরে-দুইবছরে পীরসাহেব একবার এলেই তাঁরা তাঁর খাতির-খেদমত করার জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন। (খেমে হঠাৎ রেগে) আমি কি বকরি-ঈদের গরু ছাগল নাকি?
- খোদেজা — কী চণ্ডের কথাই যে তুমি বলো! পীরের সঙ্গে বিয়ে হওয়াটা কোনো খারাপ কথা নয়। (হঠাৎ মনে পড়ায়) ভালো কথা, পীরসাহেব রাতেও খাবেন নাকি, হাশেম?
- হাশেম — না। দুপুরে খাওয়ার পরেই চলে যাবেন। আঝা অনেক বললেন কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। তাঁর নাকি জরুরি কাজ আছে। পীরসাহেবের লেবাসও দুপুরের মধ্যে শুকিয়ে যাবে। কাল রাতে মাঝিরা তাঁকে আমাদের বজরায় তুলে না নিলে তিনি হয়তো ডুবুই মারা যেতেন।
- খোদেজা — তাঁর নৌকার সঙ্গে বজরার কী করে ধাক্কা লাগল বুঝলাম না।
- হাশেম — ঝড়ের সময় বজরা আর নৌকা একই সঙ্গে খালের ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করছিল। অন্ধকারের মধ্যে আর হাওয়ার ধাক্কা মাঝিরা বোধ হয় ঠিক সামাল দিতে পারেনি। ধাক্কা খেয়ে নৌকাটা এক মিনিটে আধা-ডোবা হয়ে গেল। ভাগ্য ভালো, বজরার কিছু হয়নি। মনে হয়, ধাক্কা খাওয়ার আগেই পীরসাহেবের নৌকাটা বেসামাল হয়ে পড়েছিল। পীরসাহেব আর তাঁর সঙ্গী দুজনেই কিছুটা নাকানি-চুবানি খেয়েছেন।
- খোদেজা — কিন্তু আমাদের বজরায় কী হচ্ছে বুঝতে পারছি না। কোথেকে এলো অচেনা-অজানা এই মেয়েটি। তারপর পানিতে ডুবে মরতে মরতে বজরায় উঠে জান বাঁচালেন এক পীরসাহেব।
- হাশেম — (তাহেরার দিকে তাকিয়ে) এই পীরসাহেব আপনার পীরসাহেব নন তো?
- তাহেরা — না। তাঁকে ভালো না দেখলেও তাঁর গলা অনেক শুনেছি। নিশ্চয়ই গলা চিনতাম। তা ছাড়া তিনি হঠাৎ নৌকা করে এদিকে যাবেনই বা কোথায়?

- হাশেম — (রসিকতা করে) হয়তো আপনার খোঁজে বেরিয়েছেন।
- তাহেরা — (কথাটা ভেবে ভয় পায়; কিছু বলে না।)
- খোদেজা — তাহলে তো ভালোই হয়। এই বজরাতেই পীরসাহেব আর তাঁর বিবির মিলন হয়, মাঝখানে থেকে আমরা কিছু সওয়াব পাই।
- তাহেরা — (হঠাৎ তরকারি কোটা বন্ধ করে অধীরভাবে সোজা হয়ে বসে) না না, এমন কথা বলবেন না।
- খোদেজা — (বিরক্ত হয়ে) না, এমন মেয়ে কখনো দেখিনি, বাবা। বয়স হলেও পীর হলো পীর। তা ছাড়া জোয়ান পীর তো দেখা যায় না।

[পাশের ঘর থেকে হাতেম আলি ছেলেকে ডাকেন, হাশেম, হাশেম। হাশেম সেই কামরায় যায়। যাওয়ার সময় দরজা খুলে তাহেরা উঁকি মেরে দেখে, তারপর হঠাৎ শুদ্ধ হয়ে বসে থাকে। তাহেরা আর খোদেজা মাঝে মাঝে আলাপ করবে বটে, কিন্তু এবার তাদের কথার আওয়াজ দর্শকদের নিকট পৌঁছাবে না।]

- হাতেম আলি — পাশের ঘরে বসে আছ কেন? পীরসাহেবের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করো। (হাশেম দূরে একটা মোড়ায় বসে।) ছেলেটি কলেজে পড়া শেষ করে এখন ছাপাখানা দিতে চায়। বলে, ছাপাখানার ব্যবসা বড় ভালো। আমি কিন্তু অত বুঝি না। শরীরটা আমার ভালো নাই। আমি বলি, কদিন বাঁচি না-বাঁচি ঠিক নাই, যত দিন জিন্দা আছি আমার সঙ্গে থাকে। আমার তো আর ছেলেপুলে নাই। কিন্তু কী বলব, সবই খোদার মর্জি, তাঁর ইচ্ছা বোঝা মুশকিল, কার ভাগ্যে কী আছে তাই বা কে জানে। ধরুন না কেন, আপনার সঙ্গে এইভাবে দেখা হবে এ-কথা কী কখনো কল্পনা করতে পেরেছি? কে ভেবেছিল হঠাৎ এমন ঝড় উঠবে, খালের ভেতরে ঢোকার সময় আমার বজরার সঙ্গে আপনার নৌকার এমন ধাক্কা লাগবে, যার দরুন আপনার নৌকা আধা-ডোবা হবে? কিন্তু সে যা-ই হোক, আপনার যে শারীরিক কোনো ক্ষতি হয় নাই, তার জন্য খোদার কাছে হাজার শোকর। তা ছাড়া, দুর্ঘটনার সময় আপনাকে আমার বজরার স্থান দিতে পেরেছি তাতে আমি নিজেকে বড় ধন্য মনে করছি।

- বহিপীর — সবই খোদার হুকুম। (থেমে) আপনার সম্পূর্ণ পরিচয়-তো এখনো পাইলাম না।

- হাতেম আলি — আমার নাম হাতেম আলি। রেশমপুরে আমার যৎকিঞ্চিৎ জমিদারি আছে। এইটে আমার একমাত্র ছেলে, নাম হাশেম আলি। একটু অস্থির প্রকৃতির, খোদা চাহে-তো মতিগতি ভালোই। সে যা-হোক। কদিন ধরে আমার শরীরটা মোটেই সুবিধার মনে হচ্ছে না, ভাবলাম, শহরে এসে দাওয়াই করাই। একাই আসতে চেয়েছিলাম; কিন্তু বিবি সাহেবা আর ছেলেটি একা আসতে দিল না। যাক, এসেছে ভালোই হয়েছে। (থেমে) আচ্ছা পীরসাহেব, বেয়াদপি মনে না করেন তো একটু সওয়াল করি। আপনার নাম বহিপীর কী করে হলো?

- বহিপীর — আপনি লক্ষ করিয়া থাকিবেন যে আমি কথাবার্তা বিলকুল বহির ভাষাতেই করিয়া থাকি। ইহার একটু হেতু আছে। দেশের নানা স্থানে আমার মুরিদান। একেক স্থানে একেক চণ্ডের জ্বান চালু। এক স্থানের জ্বান অন্য স্থানে বোধগম্য হয় না, হইলেও হাস্যকর ঠেকে। আমি আর কী করি। আমাকে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সব দিকেই যাইতে হয়, আমি আর কত ভাষা বলিতে পারি। সে সমস্যার সমাধান করিবার জন্যই আমি বহির ভাষা রঙ করিয়া সে ভাষাতে আলাপ-আলোচনা কথাবার্তা করিয়া থাকি, বহির ভাষাই আমার একমাত্র জ্বান। তা ছাড়া কথ্য ভাষা আমার কানে কটু ঠেকে। মনে হয়, তাহাতে পবিত্রতা নাই, গম্ভীর্য নাই। আমার কর্তব্য মানুষের কাছে খোদার বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া। উক্ত কার্যের জন্য পুস্তকের ভাষার মতো পবিত্র ও গম্ভীর আর কোনো ভাষা নাই। কথ্য ভাষা হইল মাঠ ঘাটের ভাষা, খোদার বাণী বহন করার উপযুক্ততা তাহার নাই।

- হাতেম আলি — আপনি ঠিক কথাই বলেছেন, বইয়ের ভাষার মতো আর ভাষা নাই। একটা কথা পীরসাহেব, দুর্ঘটনায় আপনার যাত্রার ব্যাঘাত ঘটেনি তো? আপনি কি এই শহরেই আসছিলেন?
- বহিপীর — (ইতস্তত করে) ব্যাঘাত? হ্যাঁ ব্যাঘাত কিছু ঘটিয়াছে বৈকি। তবে অতি নিকটেই কোথাও আমাকে ঘাইতে হইবে। একটু দেরি হইল বটে, কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। ঝাওয়া-দাওয়ার পরই হকিকুল্লাহ মজবুত দেখিয়া একটি নৌকা ঠিকা করিয়া লইবে, তারপর আবার রওয়ানা হইয়া পড়িব। জানে বাঁচিয়া আছি ইহাই যথেষ্ট। খোদার ভেদ বোঝা সত্যই মুশকিল। কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটাইলেন, মরিতে মরিতে কেন আবার বাঁচিয়া রহিলাম আর আপনার বজরাতেই কেন বা আশ্রয় পাইলাম, তাহা তিনিই জানেন। কেবল ইহাই বলিতে পারি যে, নিশ্চয় ইহাতে কোনো গুণ্ডতন্তু আছে, যাহা এখন বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমি বড় শান্ত বোধ করিতেছি। আশা করি শরীর খারাপ হইবে না। কত আর ছোটোছুটি করিতে পারি। বয়স-তো হইয়াছে। একেকবার ভাবি, যাহা চাহিয়াছিলাম তাহা পাই নাই, কেবল মুরিদান করিয়াই জীবন কাটাইয়াছি। মুরিদ হওয়ার জন্য লোকেরা দলেবলে আসিয়াছে, কেহ কাঁদিয়াছে, কেহ ধনসম্পদ উজাড় করিয়া আমার পায় ঢালিয়া দিয়াছে। তাহারাই আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, আমাকে কোনো অবসর দেয় নাই, এবাদত করিবার ফুরসত দেয় নাই। সারা জীবন কেবল মুরিদের মঙ্গল কামনাই করিয়াছি, কখনো ফল পাইয়াছি কখনো পাই নাই, সবই খোদার ইচ্ছা। কিন্তু এখনো সময় আছে। মধ্যে মধ্যে ভাবি, সমস্ত ছাড়িয়া ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়ি যেই দিকে দুই চোখ যায়, সেই দিকে পা দুইটা আমাকে লইয়া যায়।
- হাতেম আলি — হয়তো খোদা তা চান না।
- বহিপীর — হয়তো।
- খোদেজা — (পাশের ঘর থেকে) হাশেম! (এক ডাকেই হাশেম উঠে সেই কামরায় যায়।)
- [এখন সে, কামরারই কথাবার্তার আওয়াজ দর্শকের কাছে পৌছাবে; বহিপীর ও হাতেম আলি হাত-মুখ নেড়ে কথা বলতে থাকবে বটে, কিন্তু সে আওয়াজ শোনা যাবে না।]
- খোদেজা — মেয়েটি দ্যাখ কেমন করছে। তুই যখন পাশের কামরায় যাচ্ছিলি, তখন খোলা দরজা দিয়ে পীরসাহেবকে সে দেখেছে। ওর সন্দেহ হচ্ছে, তিনিই সেই পীর।
- তাহেরা — (তরকারি কোটা ছেড়ে সোজা হয়ে বসে) তিনি কে?
- হাশেম — তাঁর নাম বহিপীর, তিনি এদিককার লোক নন; উত্তরে সুনামগঞ্জে তাঁর বাড়ি।
- তাহেরা — (সভয়ে আপন মনে) ইনিই তিনি, বহিপীর। যিনি বইয়ের ভাষায় কথা বলেন। বাপজান আর সৎমা যাঁর মুরিদ আর যাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। (খেমে) তিনি আমার খোঁজে বেরিয়েছেন। [হঠাৎ লাফিয়ে উঠে জানালার কাছে গিয়ে গলা বাড়িয়ে পানি দেখে।]
- হাশেম — আম্মা! উনি কি করছেন ওখানে?
- তাহেরা — (এদের দিকে ঘুরে বিস্ফারিত চোখে) খবরদার! আমার কাছে কেউ আসবেন না, এলেই আমি পানিতে ঝাঁপ দেব। আমি সাঁতার জানি না, পানিতে ডুবে মরব।
- খোদেজা — (চিৎকার করে) অরে, এই মেয়েটা পাগলি দেখছি। কী বলে সে।
- হাশেম — আম্মা চিৎকার করবেন না, পাশের ঘরে পীরসাহেব শুনবেন। তিনি এখনো জানেন না যে তাঁর বিবি এখানেই আছেন।
- তাহেরা — (বাক্স করে) তাঁর বিবি। বহিপীরের বিবি। তিনি আমাকে কখনো দেখেননি, তার ঘরও করিনি খেদমতও করিনি।

- হাশেম — দেখুন, আপনি ওখান থেকে সরে আসুন। আপনার কোনো ভয় নেই। আপনার কথা পীরসাহেব জানেন না, জানবেনও না আর খেঁরেদেয়ে দুপুরেই তিনি চলে যাবেন।
- তাহেরা — (হঠাৎ নেবে বসে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করে। মনে হবে অনেকক্ষণ কাঁদবে কিন্তু শীঘ্রই চোখ মুছে শান্ত গলায়) আমাকে যখন আশ্রয় দিয়েছেন, তখন আর এইটুকুও আমার জন্য করুন, তাঁকে আমার কথা বলবেন না।
- হাশেম — না না। কেউ বলবে না।
- খোদেজা — হাশেম, সে কেমন কথা। পীরসাহেবকে না বলে কী করে পারি? তার সঙ্গে না গেলে কোথায় যাবে মেরেটা, কে দেখবে তাকে?
- হাশেম — আম্মা। এখন তো একটু চুপ করুন।
- তাহেরা — আপনারা আমার জন্য যথেষ্ট করেছেন। ডেমরা ঘাট থেকে তুলে নিয়ে বজরায় আশ্রয় দিয়েছেন। দয়া করে আরেকটু করুন। কারণ, আমি পীরসাহেবের সঙ্গে কিছুতেই যাব না। পানিতে ঝাঁপ দিয়ে মরব, তবু যাব না। আমার কথা অবিশ্বাস করবেন না।
- হাশেম — (হঠাৎ জোর দিয়ে) দেখুন, আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার কোনো ভয় নেই। আমি কথা দিচ্ছি, পীরসাহেবের সঙ্গে আপনাকে ফিরে যেতে হবে না।
- খোদেজা — তুই আবার এর মধ্যে অত লম্বা-চওড়া কথা বলিস কেন? তোর বাপ ফিরে আসুন, তিনি বুঝে-শুনে যা-ই করতে বলবেন তা-ই করা হবে। (পাশের ঘর থেকে পীরসাহেব ডাকেন, হাশেম মিঞা) ঐ যে পীরসাহেব তোকে ডাকছেন। গিয়ে দ্যাখ, তাঁর কী চাই। তা ছাড়া এ ঘরে তোর অত ঘুরঘুর করার কী প্রয়োজন? মেয়েটারও যেন একটু লজ্জা-শরম নাই। থাকলে কী এমন করে পালাতে পারে?
- বহিপীর — হাশেম বাবা—। ও হাশেম মিঞা!
- হাশেম — (গলা উচিয়ে) এই যে আসছি পীরসাহেব। (তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে) আম্মা, ছেলে হয়েও আপনার সঙ্গে কোনো দিন এত কথা বলি নাই বা মুখের ওপর জবাব দিই নাই। কিন্তু এখন সব যেন কেমন ওলট-পালট হয়ে গেছে। কাজেই আমাকে বলতেই হচ্ছে। আম্মা, শোনেন আমার কথা। পথ থেকে একটা বিপন্ন মেয়েকে তুলে নিয়েছেন। ভুল করে হোক আর যা-ই করে হোক, তিনি ঘর ছেড়ে পালিয়েছেন—সেটা একটি মেয়ের পক্ষে সোজা কথা নয়। আপনি বুঝতেই পারেন তাঁর মনের অবস্থা আপনার আমার মতো নয়। হলে কি তিনি পানিতে ঝাঁপ দিয়ে নিজের হাতে নিজের জ্ঞান দেওয়ার কথা বলতেন? তা ছাড়া, ডেমরার ঘাটে তাঁকে বিপন্ন অবস্থায় দেখে আপনার মনে যখন মমতা জেগেছিল, তাঁকে না চিনে, না জেনেও যখন নিজের বজরায় তুলে নিয়েছেন, তখন তাঁর প্রতি আপনার কি একটু দায়িত্বও নেই? আম্মা, তাঁকে এখন আর কোনো কথা বলবেন না; একটু সবুজ করে থাকুন। উনি যদি সত্যি হঠাৎ পানিতে ঝাঁপ দেন, তখন আপনি কি একা তাঁকে ঠেকাতে পারবেন?
- খোদেজা — (বিস্ময়ে) তুই কী চাস? পীরসাহেবের বিবিকে নিয়ে তোর এত মাথা ব্যথা কেন?
- হাশেম — আমি বরঞ্চ পাশের ঘরে যাই, পীরসাহেব বারবার ডাকছেন।
[দ্রুতপায়ে পাশের ঘরে চলে যায়। খোদেজা কয়েক মুহূর্ত নত মুখে বসে থাকা তাহেরার দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর আবার রান্নায় হাত দেন।]
- বহিপীর — এমন জোয়ান-মর্দ ছেলে, মায়ের আঁচল ধরিয়া বসিয়া থাকিবার অভ্যাস কেন?
- হাশেম — রান্নাবান্না হচ্ছে, একটু সাহায্য করছিলাম। কেন ডাকছিলেন?

- বহিপীর — বিশেষ কিছু না। ভাবিতেছিলাম, আপনার হইল কী। হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইলেন না তো?
- হাশেম — কী করে নিরুদ্দেশ হই? পানিতে বাপ দিয়ে না পড়লে ওই কামরা থেকে তো আর পালানো যায় না।
- বহিপীর — উত্তম কথা, উত্তম কথা!
- হাশেম — উত্তম কথা, কেন বলছেন পীরসাহেব?
- বহিপীর — না না উহা একটি কথার কথা, কিন্তু যে জন্য ডাকিয়াছিলাম। আরে, তাই তো কী জন্য ডাকিলাম তাহা আর মনে পড়িতেছে না। বোধ হয়, একাকী বসিয়া বসিয়া ভালো লাগিতেছিল না। সর্বদা ওয়াজ-নহিহত করিবার অভ্যাস, কাহারও সঙ্গে কথা না কহিয়া বেশিক্ষণ থাকিতে পারি না। তা ছাড়া একাকী চুপচাপ বসিয়া থাকিলে মনে অশান্তি হয়। সে কথা যাক। আপনার আক্বা ফিরিতে এত দেরি করিতেছেন কেন?
- হাশেম — (পাড়ের দিকে তাকিয়ে) এই যে তিনি ফিরেছেন।
- [হাতেম আলি অতি ধীর পায়ে প্রবেশ করেন, তাঁর মুখ চিন্তাভাবাচ্ছন্ন। তাঁকে আরও দুর্বল দেখায়, লাঠি হাতেই তিনি তফাতে বেঞ্চির ওপর বসে নীরব হয়ে থাকেন।]
- হাশেম — আক্বা! আপনার কী হয়েছে? আপনাকে অমন দেখাচ্ছে কেন?
- বহিপীর — (হাতেম আলি কোনো উত্তর না দেয়ায়) খোদা না করুন, কোনো দুঃসংবাদ নাইতো জমিদার সাহেব?
- হাতেম আলি — (মুখ তুলে চেয়ে) দুঃসংবাদ? না, দুঃসংবাদ আর কী? তবে অসুস্থ শরীরে চলাফেরা করায়ও একটু হয়রান বোধ করছি। হাশেম, আমাকে এক গ্লাস পানি এনে দাও।
- [হাশেম ক্ষিপ্ৰগতিতে পাশের ঘরে যায়, গিয়ে নিজেই কলসি থেকে পানি ঢালে।]
- খোদেজা — পানি কার জন্য, হাশেম?
- হাশেম — আক্বার জন্য, তাকে অত্যন্ত হয়রান দেখাচ্ছে।
- খোদেজা — কেন হয়রান দেখাচ্ছে? কী হয়েছে তাঁর? ডাক্তার কী বলল হাশেম?
- হাশেম — (দ্রুতপায়ে বেরিয়ে যেতে যেতে) এখনো জানি না।
- হাতেম আলি — (পানি পান করে) হাশেম, আমি পীরসাহেবের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই, তুমি পাশের ঘরে যাও।
- হাশেম — (অধীর হয়ে) কী এমন কথা আপনি পীরসাহেবকে বলবেন আমি শুনতে পারি না?
- হাতেম আলি — হাশেম।
- বহিপীর — যাও বাবা, বাপের মুখের ওপর কথা কহিও না।
- [হাশেম গ্লাস তুলে নিয়ে পাশের ঘরে চলে যায়, গিয়ে সটান বেঞ্চিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে। খোদেজা উঠে এসে পাশে দাঁড়িয়ে আলাপ করে কিন্তু তার আওয়াজ শোনা যাবে না।]
- হাতেম আলি — (মেঝের দিকে চেয়ে) পীরসাহেব, আমার মাথার ওপর হঠাৎ যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে; চারদিকে আমি অন্ধকার দেখছি। আমার পায়ের তলা থেকেও যেন মাটি সরে যাচ্ছে।
- বহিপীর — কী ব্যাপার, খুলিয়া বলেন। আমাকে বলিতে দ্বিধা করিবেন না।
- হাতেম আলি — আপনার বহুত মেহেরবানি পীরসাহেব, যে আপনি দুঃখের কথা শুনতে চাবেন, তাতে একটু ভরসা পাচ্ছি। আপনাকে বলে মনের চিন্তা হয়তো লাঘব হবে, হয়তো আপনি আমাকে একটু পথও বাতলে দিতে পারবেন। সত্যি আমি কোনো পুথ দেখছি না। এখন কী করে যে নিজের পরিবারের কাছে আর দেশের দশজনের কাছে মুখ দেখাব, জানি না।

- বহিপীর — খোদা যা করেন তা ভালোর জন্যই করেন, আজই তাহার আরেকটি প্রমাণ হাতেনাতে পাইয়াছি। আপনি দিল খুলিয়া সমস্ত কথা আমাকে বলেন।
- হাতেম আলি — প্রথমে একটি ব্যাপারে আমি আপনার কাছে মাফ চাই। আমি আপনার কাছে একটা বুট কথা বলেছি। বলেছি, আমার শরীর অসুস্থ, দাওয়াই করার জন্য শহরে এসেছি। সে কথা সত্য নয়, তবে চিন্তায় কদিনে এত কাহিল হয়ে পড়েছি যে রোগশয্যায় আছি বলেই মনে হয়। শরীরে এক ফোঁটা রক্ত নেই যেন। কিন্তু পীরসাহেব, অসুখের ভান না করে আমার উপায় ছিল না। ব্যাপারটা গোপন রাখব ভেবেই অসুখের ভান করেছিলাম। মুখে দুশ্চিন্তায় যে ছায়া পড়েছিল সে দুশ্চিন্তার যুক্তিসঙ্গত কোনো উত্তর ছিল না। ওরা যখন সঙ্গে আসতে চাইল অসুখের কথা শুনে, তখন জোর করে না-ও করতে পারলাম না। একবার বুট কথা বললে উপায় নেই, তখন একটার পর একটা বলতে হয়; একবার শুরু হলে তার শেষ নাই। কিন্তু এখন সবকিছু শেষ হয়েছে, আসল কথাটা আর মিথ্যা কথা দিয়ে ঠাকা দেওয়া যায় না।
- বহিপীর — খোদা ইচ্ছা করিলে পড়ন্ত ঘরও ঠাকা দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখা যায়। ভালোমন্দ খোদারই হাতে। বলেন জমিদার সাহেব, বলেন কী ব্যাপার।
- হাতেম আলি — আপনাকে বলেছি রেশমপুরে আমার কিঞ্চিৎ জমিদারি আছে। একসময়ে এই জমিদারের নাম ডাক ছিল, তার আয়ও ছিল প্রচুর। কিন্তু সেই সুদিন আমার জমানার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমার হাতে যে জমিদারিটা এলো তা কেবল চাকের তেল বাজালে আওয়াজ হয়, কিন্তু ভেতরে অন্তঃসারশূন্য, দেখতে বড় কিন্তু ভেতরে ফাঁকা। তবু তা থেকে যৎসামান্য যা আয় হয়ে উঠত তাই দিয়ে কোনো প্রকারে মানমর্যাদা রেখে ভরণপোষণ চলত। কিন্তু সে জমিদারিও সাঙ্ঘ্য আইনে পড়ে নিলামে উঠতে বসেছে। কালই নিলামে উঠবে।
- বহিপীর — সবই খোদার ইচ্ছা, খোদাই দুনিয়ার মালিক।
- হাতেম আলি — আমার আশা ছিল, আমি কোনো প্রকারে যথেষ্ট টাকা জোগাড় করতে পারব, শেষ পর্যন্ত জমিদারি নিলামে চড়াটা বন্ধ করতে পারব। সে আশা নিয়েই আমি শহরে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম, আমার বাল্যবন্ধু আনোয়ারউদ্দিন আমাকে সাহায্য করবেন, সেখানে আমাকে নিরাশ হতে হলো। আনোয়ারউদ্দিন বলে দিলেন তিনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন না। পীরসাহেব, জমিদারি আর বাঁচানো যাবে না, এবার সে জমিদারি যাবেই! আমি দেউলে হব, আমার পরিবার দেউলে হবে; আমার সবকিছু উচ্ছেদ যাবে। (খেমে) আর কথটা লুকিয়ে রাখি কী করে? এবার আমি কীই বা করি! (খেমে) আমার ছেলেটি কত আশা করেছিল যে তাকে ছাপাখানা কেনার টাকা দেব, এবার তার সাধের স্বপ্নও ভাঙবে।
- বহিপীর — আহা জমিদার সাহেব, এত বেচাইন হইয়া পড়িবেন না, খোদার উপর তোয়াক্কা রাখুন। দুনিয়াটা মস্ত এক পরীক্ষা ক্ষেত্র। খোদা কাকে কীভাবে পরীক্ষা করেন তা বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের নাই।
- হাতেম আলি — (হঠাৎ রেগে) পরীক্ষা? কিসের পরীক্ষা। আমি কী অন্যায় করেছি, আমার বিবি সাহেব ও আমার ছেলেই বা কি অন্যায় করেছে?
- বহিপীর — জমিদার সাহেব। দুঃখে সংবিল হারাইবেন না।
- হাতেম আলি — (নাক বেড়ে ক্রন্দন সম্বরণ করে) না না মানসন্মান সম্পত্তি সবই যখন গেল, তখন কী আর মাথা হারালে চলে? ভাববার বুঝবার শক্তিও যদি যায়, তবে থাকবে কী, কিন্তু আমার মনে শক্তি কোথায়? পীরসাহেব, এবার আমি কী করব?
- বহিপীর — ধৈর্য ধরুন জমিদার সাহেব। এই মুহূর্তে ইহা ব্যতীত আর কিছু বলিতে পারি না। কিন্তু আপনাকেও আমার একটি জরুরি কথা বলার আছে। দুঃখের বিষয় এই যে, আপনার এই

নিদারুণ বিপদের সময়ই আমাকে এই কথা বলিতে হইতেছে। যদি পারেন, একটু মনোযোগ দিয়া আমার কথা শ্রবণ করুন।

হাতেম আলি — (নিস্তেজ গলায়) বলুন!

বহিপীর — শীঘ্রই শেষ করিব, দেরি হইবে না বলিতে। গোড়া হইতে বলি। আপনি যেমন আমার নিকট হইতে একটি কথা লুকাইয়াছেন, তেমনি আমি একটি কথা আপনার নিকট হইতে লুকাইয়াছি। আমার এই যাত্রার আসল উদ্দেশ্য আপনাকে বলি নাই, আমার উদ্দেশ্য এখন হাসিল হইয়াছে, তাই বলিতে তো বাধা নাই। উপরন্তু আপনি ব্যাপারটার সহিত জড়িত আছেন বলিয়া আমাকে বলিতেই হইবে। না হইলে আপনার এই দুঃখের সময় কথাটা পাড়িতাম না।

হাতেম আলি — আমি জড়িত? কীভাবে পীরসাহেব?

বহিপীর — অতি আশ্চর্য; কিন্তু উহা সত্য। ব্যাপারটা হইতেছে এই; গত জুম্মা রাতে তাহেরা বিবি নামে একটি বালিকার সঙ্গে আমার শাদি যোবারক সম্পন্ন হয়। তিনি আমার এক পেয়ারা মুরিদের কন্যা। অত্যন্ত হাউস করিয়া তিনি আমার সহিত তাঁহার কন্যার শাদি দিয়াছিলেন। তিনিই কথা পাড়িয়াছিলেন। আমি ভাবিয়া দেখিলাম, নেক পরহেজগার মানুষ: বিষয়-আশয় তেমন না থাকিলেও বংশ খান্দানি। আমারও বয়স হইয়াছে, দেখভাল করিবার জন্য আর খেদমতের জন্য একটি আপন লোকের প্রয়োজন আছে। আমার প্রথম জ্বর এন্ডেকাল হয় চৌদ্দ বৎসর আগে। আমি পুনর্বীর শাদি না করিয়া খোদার এবাদত আর মানুষের খেদমতই করিয়াছি। আমার সন্তান-সম্ভ্রতিও নাই, দেখাশুনা করিবার জন্য এক হকিকুল্লাহ্ আছে। কিন্তু সে আর কত করিতে পারে। দেখিলাম, বিবাহ করাটাই সমীচীন হইবে। অতএব আমি নিমরাজি হইতেই বাকি কার্যের ভার আমার পেয়ারা মুরিদ নিজের হাতেই গ্রহণ করিলেন। কিন্তু বিবাহের রাতেই এক অত্যাশ্চর্য ইসানে গায়ের-মামুলি কাণ্ড ঘটিল। আমার বিবি যাঁহাকে তখনো আমি দেখি নাই—একটি নাবালেগ চাচাতো ভাইকে সঙ্গে করিয়া বাড়ি ছাড়িয়া পালাইয়া গেলেন। বাড়িতে ছলুছল পড়িল। আমার মুরিদের মুখ ভয়ে শুকাইয়া গেল। আমি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম যে তাঁহার ইহাতে কোনো কসুর নাই, তাঁহার কন্যার ব্যবহারের জন্য তাহাকে দোষারোপ করা যায় না, অবশ্য তাহার যে দোষ নাই সে কথা বলাও সঠিক হইবে না। পুত্র-কন্যার শিক্ষাদীক্ষার ভার পিতা-মাতার উপরেই। সে শিক্ষাদীক্ষার গাফিলতি হইলে দোষটা পিতামাতার ঘাড়েই পড়ে। সে কথা যাক। আমার মুরিদ অধীর হইয়া পুলিশে পর্বন্ত খবর দিতে চাহিলেন। কিন্তু তাহাতে আমি মত দিলাম না। পুলিশ নিরা ঘাঁটাঘাঁটি করিলে জানাজানি হইবার সম্ভাবনা; উহা কেই বা চায়। আমি বলিলাম, আমিই ঝুঁজিতে বাহির হইব। সেই রাতেই হকিকুল্লাহ্কে সঙ্গে করিয়া আমি বাহির হইয়া পড়িলাম। ঠিক পথই ধরিয়াছিলাম এবং এতক্ষণ তাঁহাকে ধরিতেও পারিতাম যদি কদমতলা না গিয়া ডেমরা যাইতাম, কিন্তু কী বলিব, ভুলটা খোদাই শোধরাইয়া দিলেন আপনার বজরার সঙ্গে আমার নৌকার সংঘর্ষ ঘটাইয়া। কারণ, ডেমরার ঘাট হইতে আপনি আমার বিবিকে তুলিয়া লইয়াছেন। এখন তিনি পাশের কামরাতেই অবস্থান করিতেছেন।

হাতেম আলি — পাশের ঘরে? আহ! আমার মাথাটার কী হয়েছে। দৃষ্টিভ্রায় পড়ে তাঁর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, কাল ডেমরার ঘাটে আমার বিবি একটি মেয়েকে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি আপনার বিবি?

বহিপীর — সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনি জানান তিনি কে, কোথায় বাড়ি কী তাঁর নাম?

হাতেম আলি — জি না। মনের চিন্তায় ছিলাম, ও কথা জিজ্ঞাসা করার খেয়াল হয়নি।

- বহিপীর — হুঁ। না, আমার মনে কোনোই সন্দেহ নাই যে যাঁহাকে আপনারা কাল ডেমরার ঘাট হইতে তুলিয়া লইয়াছেন তিনিই আমার পলাতকা বিবি। কিন্তু তবু সাবধানের মার নাই। কথাটা একটু গওর করিয়া দেখুন। শুনিতেন তো জমিদার সাহেব।
- হাতেম আলি — (একটু ঘুরে বসে বহিপীরের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে) মনে শান্তি নাই পীরসাহেব, কিন্তু শুনছি আপনার কথা।
- বহিপীর — যাহা বলিতেছিলাম। আমি তাঁহাকে কখনো দেখি নাই। আপনারাও তাঁহাকে চেনেন না। তিনি ঘর ছাড়িয়া আমার ভয়ে পালাইয়া আসিয়াছেন। কাজেই আমি বলা মাত্র তিনি যে সুড়সুড় করিয়া আমার সঙ্গে চলিয়া আসিবেন, সে কথা ভাবা অনুচিত হইবে। সুযোগ পাইলে তিনি আমাকে ফাঁকি দিবার ফন্দি-ফিকির নিশ্চয়ই বাহির করিবেন। অতএব, তিনি যদি আত্মপরিচয় ঢাকিয়া রাখেন তাহা হইলে প্রমাণাদি ব্যতীত তাহাকে আমার বিবি বলিয়া দাবি করা মুশকিল হইতে পারে। আপনার এখানে তিনি একাই আছেন, তাহার চাচাতো ভাইটি নাই। সে থাকিলে কোনো চিন্তা ছিল না। সেই নিশানাটি হারাইয়াই তো মুশকিল হইয়াছে। তবে একটা ভরসা। বলিলে নিজেরই ক্ষতি হইবে জানিয়াও স্ত্রীলোক কখনো পেটে কথা চাপিয়া রাখিতে পারে না। বিশেষ করিয়া আপনার সঙ্গে আমার যখন কোনোই যোগাযোগ ছিল না, তখন হয়তো বা তিনি আপনার স্ত্রীর নিকট নিজের আত্মপরিচয় ঢাকিয়া রাখেন নাই। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে সন্দেহ না জানাইয়া সে কথাটা প্রথমে যাচাই করিয়া লইতে চাই। আপনার ছেলে সে ঘরেই বড় বেশি ঘুরঘুর করিতেছে। সেও জানিয়া থাকিতে পারে। প্রথমে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে কেমন হয়? জমিদার সাহেব। অত বেহুঁশ হইয়া পড়িলে কি হইবে?
- হাতেম আলি — (জেগে উঠে) না না। বেহুঁশ হয়ে পড়েছি কোথার। বলুন পীরসাহেব।
- বহিপীর — (সুব বদলে) ধৈর্যহার্য হইবেন না জমিদার সাহেব। দুনিয়াটা সত্যি কঠিন পরীক্ষাক্ষেত্র। কিন্তু দেখিতেছেন না এই বজরাতে ভাগ্যের কেমন অত্যাশ্চর্য লীলাখেলা চলিতেছে? ইহা সবই খোদার ইজিতে হইতেছে। আপনি বুকে সাহস ধরুন; আপনার সমস্যাও সমাধান হইবে! জমিদার সাহেব, আপনার ছেলেকে একটু ডাকিবেন?
- হাতেম আলি — জি। হাশেম! (পাশের কামরা থেকে উঠে ক্ষিপ্ৰগতিতে হাশেম এ কামরায় এসে হাজির হয়) হাশেম। পীরসাহেব তোমাকে ডেকেছেন।
- বহিপীর — বাবা হাশেম, তোমাকে একটি প্রশ্ন করিতে চাই। কাল ডেমরার ঘাটে একটি বিবাহিতা তরুণীকে বিপন্ন অবস্থায় দেখিয়া তোমাদের বজরায় ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছ। তাঁহার পরিচয় কি তিনি তোমাদের বলিয়াছেন।
- হাশেম — (ইতস্তত করে) বোধ হয় বলেছেন। আমি ঠিক জানি না।
- বহিপীর — তাঁহার পরিচয় জানা আমার বিশেষ প্রয়োজন। আপনি ভিতরে যান, আর কথায় কথায় তাঁহার পরিচয় জানিয়া লউন। আমি যে জানিতে চাই তাহা অবশ্য বলিবেন না।
- হাশেম — জি আচ্ছা। (হাশেম ভেতরে যায়, গিয়ে দরজা ধরে চুপচাপ ভাবিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে।)
- খোদেজা — হাশেম, কী হয়েছে তোর আক্বার?
- হাশেম — কিছু বুঝতে পারছি না। আক্বা পীরসাহেবের সঙ্গে কী আলাপ করলেন তাও জানি না। কিন্তু এখন তিনি ওঁর (ইজিতে তাহেরাকে দেখিয়ে) পরিচয় জানতে চান। তার অর্থ হলো এই যে, তাঁর কথা তিনি সঠিকভাবে পুরোপুরি জানেন না। (ভেবে) ব্যাপারটা বুঝেছি। (হঠাৎ মাথার কাছে উবু হয়ে বসে) আম্মা! পীরসাহেব তাঁকে কখনো দেখেননি। তিনিই যে তাঁর বিবি সে কথাও ঠিক জানেন না। একটি মেয়েকে ডেমরার ঘাট হতে তুলে আমরা আশ্রয় দিয়েছি, সে কথাই শুধু

জানতে পেরেছেন। যদি আমরা তাঁকে তাঁর সঠিক পরিচয় না বলি, তবে তিনি জানতেই পারবেন না যে তিনিই তাঁর বিবি। আপনি যদি অনুমতি দেন তবে পীরসাহেবকে তাঁর পরিচয় বলি না।

- খোদেজা — হাশেম। এ কী করে সম্ভব! তোর কি মাথা খারাপ হলো নাকি? এই মেয়েটা তোর মাথা খেলো নাকি?
- হাশেম — (উঠে দাঁড়িয়ে) মাথা খাবে কেন? কিন্তু আমরা কি তাঁকে এইটুকু সাহায্য করতে পারি না? আপনি এই কথা বুঝতে পারছেন না যে আমরা যদি তাঁকে সাহায্য না করি তবে তাঁর জীবনটা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আম্মা, আমি পীরসাহেবকে গিয়ে বলছি যে তিনি আমাদের তাঁর আত্মপরিচয় দেননি। আমরা জানি না কোথায় তাঁর বাড়ি, কী তাঁর নাম।
- খোদেজা — হাশেম। তোর হয়েছে কী? কী চাস তুই?
- হাশেম — (দ্রুত মাথা নেড়ে) না, আমি কিছুই চাই না। শুধু তাঁকে বাঁচাতে সাহায্য করতে চাই।
- খোদেজা — যার সঙ্গে পীরসাহেবের ন্যায়মতো বিয়ে হয়েছে তাকে তুই বাঁচাবার কে?
- হাশেম — আম্মা! আমি তাঁকে বাঁচাবই। তাঁকে বিয়ে করে হলেও বাঁচাব। আম্মা শুনছেন।
- খোদেজা — তুই কি সত্যিই এই চাস যে পীরসাহেবের বদদোয়া নিয়ে সংসারে আগুন ধরিয়ে দিই? পীরের দোয়ার জন্য মানুষ কি-না করে আর তুই একটি অচেনা-অজানা মেয়ের জন্য সম্ভ্রমে মাথায় বদদোয়া ডেকে নিবি? না, আমিই বলব। তুই যদি না বলিস তবে আমিই নিজেই বলব। (ক্ষিপ্ৰভঙ্গিতে উঠে পড়ে দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে) পীরসাহেব, আপনার বিবি আমার সঙ্গেই আছেন।
- হাশেম — আম্মা।
- বহিপীর — শোকর আল্‌হামদোলিল্লাহ!
- [তাহেরা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। হাশেম বিস্ময়াভিভূত। শুধু জমিদার সাহেব নিস্তেজভাবে মেঝের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন।]

[পর্দা নামবে]

দ্বিতীয় অঙ্ক

(স্টেজ পূর্ববৎ, কিন্তু বজরাটা ছাড়া সবকিছু রাতের অন্ধকারে ঢাকা। আকাশে ছিটেকোটো তারা।)

দুই কামরাতেই লণ্ঠন জ্বালানো আছে। বাইরের ঘরে মোড়ার ওপর স্বপ্নাবিষ্টের মতো বসে হাতেম আলি। চোখের পাতা পড়ে না; দৃষ্টি ভাবনায় নিমজ্জিত। বেষ্টিতে চাদর গায়ে বসে বহিপীর তসবি টেপেন আর ঘন ঘন ভেতরে দরজার দিকে তাকান। তাঁর পরনে রঙিন আলখাল্লা আর পায়জামা।

পাশের কামরায় হাশেম অস্থিরভাবে পায়চারি করে। পর্দা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মোনাজাত করে নামাজ শেষ করে খোদেজা পান বানাতে বসেন। ওধারে বেষ্টিতে পিঠ খাড়া করে বসে তাহেরা; তার নড়ন-চড়ন নেই আর দৃষ্টি মেঝের ওপর নিবদ্ধ।

বাইরে আবছারায় মধ্যে বসে হকিকুল্লাহ্ হুঁকা খায়। একটু দূরে চাকরটি আর মাঝি দুজন আধ-শোয়া অবস্থায় গাল-গল্প করে।

হাতেম আলি — সারা বিকাল, সারা সন্ধ্যা কাটল আশায় আশায় যে বাল্যবন্ধু আনোয়ার আসবে। ভেবেছিলাম, সাহায্য করতে পারবে না বলে থাকলেও চিরদিনের বন্ধুত্বের খাতিরে শেষে কোনো প্রকারে টাকা জোগাড় করে বাল্যবন্ধুকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে আসবে। কিন্তু সে এলো না। (থেমে) আর একটা রাত। এত দিনের পুরনো জমিদারির শেষরাত। আমার ছেলে আর তার মা এখনো জানে

না যে এইটেই তাদের জমিদারির শেষ রাত। তাদের এখনো বলতে পারিনি! এখনো কি মনে আশা আছে? আর কিসের আশা?

- বহিপীর — (কিছুটা বিরক্তভাবে) খোদার কথা খেয়াল করুন জমিদার সাহেব। বিলাপ করিয়া কী হইবে?
- হামেত আলি — তাই। বিলাপ করে কী আর হবে। তাতে রাতের গায়ে তো আর আঁচড় পড়বে না, অন্যান্য রাতের মতো এই রাতও একসময়ে শেষ হয়ে যাবে। যাক যাক, শেষ হয়ে যাক।
- বহিপীর — (দরজার দিকে তাকিয়ে) হাশেম বাবা ফিরে না কেন?
- হামেত আলি — (হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠে সামান্য বৃক্ষতার সঙ্গে) পীরসাহেব, আপনি আছেন আপনার খেয়ালে। এক বিবি গেলে আপনি আরেক বিবি আনতে পারেন। কিন্তু আমার জমিদারি একবার গেলে আর ফিরে আসবে না? একবার সর্বস্বান্ত হলে আমি আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব না। এখন আমি সর্বস্বান্ত হতে বসেছি। বুকে আর এতটুকু সাহস নাই। বিবি আর ছেলেকে যে কথাটা খুলে বলব, সে সাহস পর্যন্ত পাচ্ছি না।
- বহিপীর — দেখুন, খোদাই রিজিকদেনেওয়ালা। যার তকদিরে যত রিজিক ধার্য করা আছে, সে তাহার বেশি ভোগ করিতে পারে না। সে রিজিক ধীরে ধীরে ভোগ করিলে ভোগের সময় দীর্ঘ হইবে; দ্রুত খাইয়া ফেলিলে শীঘ্র তাহা শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু তবু খোদা কিছু না কিছু ব্যবস্থা করেন। যাহাকে একেবারে নিঃশ্ব মনে হয় তাহারও কিছু না কিছু থাকে। আর কিছু না থাকিলেও বুহানিয়াত তো থাকিতে পারে। না, কেউ কখনো একেবারে নিঃশ্ব হয় না।
- হামেত আলি — (যেন বোঝে) ঠিক কথা বলেছেন পীরসাহেব, কেউ একেবারে নিঃশ্ব হয় না। কেবল সব সময়ে বুঝে ওঠে না। বুঝি, তবু যেন বুঝি না।
- বহিপীর — সে কথা না বুঝিলেও আমার সমস্যা সম্বন্ধে খেঁটা দিয়া একটি কথা বলিতে ছাড়িলেন না। কিন্তু আমার কথাটাও একবার বুঝিবার চেষ্টা করুন। আপনার মনে হইতে পারে যে, যে বিবিকে আমি চোখে পর্যন্ত দেখি নাই বা যাঁহার সঙ্গে এক মুহূর্তের জন্য মিলিত হই নাই, তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য কেন এত প্রচেষ্টা। মানুষ সময়ের দীর্ঘতা দিয়াই সব বিচার করে, কিন্তু তাহা ভুল। একবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেই সে দায়িত্ব পালন করা একান্ত ফরজ হইয়া পড়ে। সময়ের স্বল্পতার কথা বলিয়া সে দায়িত্বের ভার হইতে নিজেকে মুক্ত করা যায় না। এক মুহূর্তের জীব প্রতি যেমন দায়িত্ব, দশ বছরের জীব প্রতিও সেই সমান দায়িত্ব। কাজেই, আমার বিবির সহিত চোখাচোখি পর্যন্ত না ঘটিয়া থাকিলেও শাদি মোবারক যখন একবার সম্পন্ন হইয়াছে, তখন তাঁহার প্রতি আমার দায়িত্ব সম্পূর্ণ মাজায় রহিয়াছে। দশ বছরের বিবিও হঠাৎ ভুলবশত কোনো তরিকাবিহীন কাজ করিয়া বসিলে আমার যেমন কর্তব্য হইত তাঁহাকে বিপথ হইতে সপথে আনা, এই বিবির প্রতিও আমার সেই সমান কর্তব্য। (থেমে গলা নিচু করে) জমিদার সাহেব আবার বেঁহুশ হইয়া পড়িয়াছেন : তাঁহার কর্ণকুহরে কিছু প্রবেশ করিতেছে না। বৃথা বকা। কিন্তু হাশেম বাবা ফিরে না কেন। ঐ কামরায় একবার ঢুকিলে সে যেন জোঁকের মতো লাগিয়া থাকে, অত আকর্ষণ কিসের? (গলা উচিয়ে) হাশেম মিঞা।
- হাশেম — পীরসাহেব আবার ডাকছেন। সারা দুপুর আর সারা বিকাল ধরে এ-কামরা সে-কামরা করছি, আর ভালো লাগে না। কত মতলবই না তিনি ঠাওরালেন, কত কথাই না বললেন। আর আমি যেন বার্তাবাহক। যেন যুদ্ধক্ষেত্রে শর্ত-পাষ্টা শর্তের কথা নিয়ে দুই জোরদার শত্রু-শিবিরের মধ্যে যাতায়াত করছি। কিন্তু বার্তাবাহককে যে দলহীন হতে হয়। কোনো দলের প্রতি একটু টান থাকলে আর ঘটনাপ্রবাহ তার অনুকূল না হলে তার পক্ষে নির্বিকার থাকা মুশকিল। আমার সত্যিই আর ভালো লাগছে না।

- তাহেরা — (সামান্য অভিমানের সুরে) আপনার এ গোলমাল ভালো না লাগলে আপনি আর কষ্ট করবেন না। আমিই পীরসাহেবকে বলব।
- হাশেম — না না; আমি কি আর সে ধরনের ভালো না লাগার কথা বলেছি। তবে মনে হয়, পীরসাহেবের মতো অত ধৈর্য আমার নাই। যখন আম্মা দরজা খুলে আপনার কথাটা পীরসাহেবকে বলে দিলেন, তখন ভাবলাম, এখুনি কিছু একটা ঘটে যাবে। কিন্তু পীরসাহেব সাবধানী লোক। সজোরে শোকর আদায় জানিয়ে সংযত হয়েই থাকলেন, খাওয়া-দাওয়া করলেন, তারপর একটু বিশ্রামও করলেন। এমন একটা ভাব যেন কোথাও কোনো দৃষ্টি নেই, সবই ঠিকঠাক আছে, তিনি কেবল সস্তীক কুটুম্ব বাড়ি বেড়াতে এসেছেন। আসলে বেড়ালের ভাব, ইঁদুরকে থাবার নিচে পেয়ে বিড়ালের যে ভাব হয়, সেই ভাব।
- খোদেজা — হাশেম।
- হাশেম — (কান না দিয়ে) তারপর ধীরেসুস্থে প্রস্তাবনা শুরু হলো এ-কথা সে-কথা, পীরসাহেব তাঁকে ঝেড়ে দিতে পর্যন্ত প্রস্তুত। তাঁর বিবির কাঁধে যে শয়তান চড়েছে সে শয়তানকে ঝেড়ে নামিয়ে দেবেন। কিন্তু সব কথাতেই তাঁর বিবি কেবল না করেন। পীরসাহেব সব শোনে আর মাথা নাড়েন। কিন্তু দেখে মনে হয় তাঁর চোখটা যেন হিংস্র জন্তুর মতো দপ করে জ্বলে ওঠে।
- খোদেজা — (রেগে) হাশেম এখানে বসে এত বেতমিজি কথা শুনতে পারি না। পীরসাহেবকে নিয়ে এসব কী কথা বলিস। দিলে কী একটু ভয়-ডর নাই?
- হাশেম — আছে আম্মা, ভয়-ডর আছে! না হলে কি একটি মেয়ে এমন করে পালায়? আর আমিই কী কেবল বার্তাবাহকের মতো এ-কামরা সে-কামরার মধ্যে ঘুরঘুর করি?
- খোদেজা — তোর এত ঘুরঘুর করার কোনোই প্রয়োজন দেখি না। তাহেরা যা বলছে তাই পীরসাহেবকে গিয়ে বল। শুনে তাঁর যা খুশি তা-ই তিনি করবেন।
- হাশেম — (বিরক্ত হয়ে) বলব আম্মা, বলব। তবে সুখবর যখন নয়, অত লাফিয়ে গিয়ে বলবারই কী প্রয়োজন? তাছাড়া ব্যাপারটা কেমন সঙ্গীন হয়ে উঠছে দেখতে পারছেন না? প্রথমে আদর-আবদার, মিষ্টি মিষ্টি কথা, তাতে কোনো ফল না হওয়ায় এখন উঠেছে পুলিশের কথা। তিনি সঙ্গে না গেলে পীরসাহেব পুলিশে খবর দেবেন, তাঁর বাপজানকে খবর দেবেন। কিন্তু তাতেও তাঁর বিবি ভয় পাচ্ছেন না। বলছেন, জুলুম করে কোনো ফল হবে না। জুলুম করলে তিনি সত্যি পানিতে ঝাঁপ দিয়ে, না হয় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করবেন।
- খোদেজা — (রেগে আপন মনে) ঐ এক কথা, আত্মহত্যা করব। মেয়েটার ঘাড়ের ওপরে শয়তান বসে নাই, তার ভিতরেও শয়তান। আর সে শয়তান তোর ঘাড়ের ওপরে যেন চেপেছে।
- হাশেম — কার ঘাড়ের শয়তান চেপেছে কে জানে। এই বুড়ো বয়সে একজন মেয়ের পেছনে ছোট্টা নেশা কি এমনিতেই হয়?
- খোদেজা — হাশেম, হাশেম। আমার সামনে এসব কী বেয়াদবি।
- হাশেম — আম্মা, একটা কথা বুঝে দেখবেন। পীরসাহেবের সঙ্গে তাঁর যে বিয়ে, সে বিয়ে কেবল নামেই বিয়ে। তিনি হ্যাঁ বলেন নাই। কোনোভাবে মতও দেন নাই।
- খোদেজা — তোর বাপের সঙ্গে যখন বিয়ে হয় তখন আমিই কি আর হ্যাঁ বলেছিলাম? বিয়ের ব্যাপার কি আইন-মকদ্দমা নাকি?
- হাশেম — আইন-মকদ্দমা নয় বলেই তো এত কথা উঠেছে। আপনি হ্যাঁ বলেননি লজ্জায়, আর উনি হ্যাঁ বলেননি মত ছিল না বলে। মত না থাকলে কোনো বিয়ে জায়েজ হতে পারে না, এ বিয়েও

জায়েজ হয়নি। যদি জায়েজ হতো, যদি তিনি পীরসাহেবের ঘর-সংসার করে পালিয়ে যেতেন তাহলে পীরসাহেবের পক্ষ নিয়ে কথা বলাটা হয়তো যুক্তিসঙ্গত হতো। সে কথা যাক, কিন্তু তাঁর প্রতি একটু দয়া-মায়াও কি হয় না আপনার। কাল যাকে আদর করে ডেকে নিয়ে আশ্রয় দিলেন, যে আজ সারা দিন আপনার সাথে থেকে রান্নাবান্নার কাজ করলো, যাঁর চুলও বেঁধে দিলেন মগরেবের আগে, তাঁর ওপর একটু মমতাও হয়না?

খোদেজা — (হঠাৎ ভিন্ন গলায়) মমতা হলেই বা কী করব? মমতা তো হয়ই। আমার মেয়ে নেই। ও যে সারা দিন আমার পাশে বসে টুকটাক কাজ করল তা বেশ ভালোই লাগল। কিন্তু তার কপাল খারাপ, আমরা কী করতে পারি? পীরসাহেব যদি না আসতেন, তবে অন্য কথা ছিল। তিনি পাশের ঘরেই আছেন। তিনি এ কথাও জানেন যে, তাঁর বিবি এখানে আছে। তার ওপর তিনি এও চাইছেন যে তাঁর বিবি তাঁর সঙ্গে যেন ফিরে যায়। তোকে বারবার বলেছি, পীরসাহেবকে অসম্ভব করে তাঁর বন্দোয়া মাথায় নিতে আমি রাজি নই। তা ছাড়া আমাদের করারও আর কিছুই নাই। ও যা বলেছে পীরসাহেবকে গিয়ে বল। তিনি পুলিশ ডাকুন বা তার বাপকে খবর দিন তা তাঁর মজি।

বহিপীর — হাশেম মিঞা। কোথায় গেলেন হাশেম মিঞা (হাশেম আর হিরুক্তি না করে পাশের ঘরে চলে যায়।)

হাশেম — পীরসাহেব, তিনি ঐ একই কথা বলছেন। বলছেন যে পুলিশ ডাকলে বা তাঁর বাপকে খবর দিলে তিনি পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবেন। কেউ নাকি ঠেকাতে পারবে না।

বহিপীর — হু! (ভাবিত হন। তারপর) দেখুন। মধ্যের দরজাটা একটু খুলিয়া দিন আমিই তাঁহার সঙ্গে আলাপ করি। আপনি সে ঘরে গিয়া কী করেন বুঝি না। (হাশেম দরজাটা সামান্য খুলে দেয়। পীরসাহেব একটা মোড়া টেনে নিয়ে দরজার কাছে বসেন।)

বিবি সাহেব—

তাহেরা — (বাধা দিয়ে উচ্চ স্বরে) আমাকে বিবি সাহেব ডাকবেন না। বিয়েতে আমি মত দিই নাই। আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি।

বহিপীর — (একটু রেগে) আপনি মত না দিলেও আপনার বাপজান দিয়াছেন। তাহা ছাড়া সাক্ষী-সাবুদ সমেত কাবিননামাও হইয়া গিয়াছে। এখন সে কথা বলিলে চলিবে কেন। (সুর बदলিয়ে) দেখুন, মন দিয়া আমার কথা শুনুন।

তাহেরা — (আবার বাধা দিয়ে) আমি আপনার কোনো কথা শুনতে চাই না। আমার বাপজান আর সখমা আপনাকে খুশি করার জন্য আপনার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। আমি যেন কোরবানির বকরি। আপনি পুলিশে খবর দিতে পারেন, আপনি আমার বাপজানকে ডেকে পাঠাতে পারেন, আমার ওপর জুলুম করতে পারেন। কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে যাব না। আপনি আমাকে দেখেননি, আমিও আপনাকে দেখিনি। আর আপনাকে আমি দেখতেও চাই না।

খোদেজা — খোদা খোদা, কোথায় যাব আমি। পীরসাহেবের মুখের ওপর এসব কী কথা বলে মেয়েটা! শুনেই আমার বুকের ভেতরটা কাঁপে।

বহিপীর — আমার কথা শোনেন।

তাহেরা — না না, আপনার কোনো কথা আমি শুনতে চাই না।

বহিপীর — (হঠাৎ রাগে আত্মহারা হয়ে) হকিকুল্লাহ! হকিকুল্লাহ! (হকিকুল্লাহ দুতপায়ে ভেতরে আসে।) যাও, পুলিশ ডাকিয়া লইয়া আসো। বহুত আদর-আবদার হইয়াছে, আর নয়। আমার মান-সম্মান যাক, তবু পুলিশ ডাকিয়া আনো। ঘাটে পুলিশ আছে, যাও হকিকুল্লাহ তাদের ডাকিয়া নিয়া আসো।

- হকিকুল্লাহ্ — জি হুজুর, এই ডেকে আনি।
(পরমুহূর্তেই বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। চিৎকার শুনে চাকরটা আর দুজনে উঠে বসে।)
- হাশেম — পীরসাহেব। পুলিশ ডাকতে পাঠিয়ে ভুল করলেন, পীরসাহেব।
[পাশের ঘরে তাহেরা হঠাৎ ক্ষিপ্তগতিতে উঠে পড়ে ঘরে গিয়ে বেষ্টিতে হাঁটু গেড়ে বসে জানলা দিয়ে গলা বের করে দিতেই খোদেজা লাফিয়ে উঠে দুহাতে তার কোমর জড়িয়ে ধরেন।]
- খোদেজা — হাশেম। এ যে গেল, গেল মেয়েটা, আমি আর তাকে ধরে রাখতে পারছি না।
[হাশেম ধাক্কা দিয়ে পীরসাহেবকে ডিঙিয়ে পাশের ঘরে যায়, গিয়ে তাহেরার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ভেতরে নিয়ে আসে। পীরসাহেব ত্বরিত গতিতে উঠে দরজার সামনে দাঁড়ান, চোখ তাঁর বিস্ফারিত। চিৎকার শুনে হকিকুল্লাহ্ও দ্রুতপায়ে পীরসাহেবের পেছনে এসে দাঁড়ায়।]
- বহিপীর — হাশেম বাবা, আপনি তাঁর হাত ছাড়িরা দিন। আমার বিবির গারে হাত দিবেন না।
- হাশেম — (বুদ্ধ স্বরে) হাত না দিলে তাঁকে বাঁচাত কে? (হাত ছেড়ে দেয়।)
- খোদেজা — খোদা খোদা, আমার মাথা ঘুরছে। (হকিকুল্লাহ্‌র দিকে চোখ পড়ায়) ও কে আবার উকি মারছে। কী হচ্ছে এই বজরায়? উনি কোথায় গেলেন?
- হকিকুল্লাহ্ — (কেশে) আমি হকিকুল্লাহ্, হুজুরের লোক।
- বহিপীর — (ঘুরে দাঁড়িয়ে) হকিকুল্লাহ্। তুমি যাও নাই পুলিশ ডাকিতে? জিব্রাইলের মতো আমার কাঁধের উপর দাঁড়াইয়া এখানে কী করিতেছ? না না এ কী হইল; কেহ কোনো কথা শুনিতেন না। (সরে গিয়ে হতাশভাবে পীরসাহেব বেষ্টিতে বসেন।)
- হকিকুল্লাহ্ — (সরে গিয়ে) ছোট মুখে বড় কথা, কিন্তু আমি একটু ভাবছিলাম হুজুর।
- বহিপীর — (বিস্ময়ে) ভাবিতেছিলে? তুমি ভাবিতেছিলে?
- হকিকুল্লাহ্ — জি। ভাবছিলাম, আপনি হয়তো রাগের মাথায় পুলিশ ডাকার কথা বলেছেন। ডেকে ফেললে পরে না আফসোস করেন।
- বহিপীর — না না ব্যাপার কিছুই বুঝিতেছি না। হকিকুল্লাহ্ পর্যন্ত ভাবিতে শুরু করিয়াছে, যাক, ভালোই করিয়াছ, ইহা পুলিশের ব্যাপার নহে। পুলিশ কীই বা করিতে পারে। হকিকুল্লাহ্, একটু হাওয়া করো। মাথাটা গরম হইয়া উঠিয়াছে।
(হকিকুল্লাহ্ পাখা নিয়ে হাওয়া করতে শুরু করে।)
- হাতেম আলি — (হঠাৎ জেগে উঠে) চারপাশে কী হচ্ছে? কিসের এত চোঁচামেচি?
- বহিপীর — (মুখ চিবিয়ে) কী আবার হইবে। একটু হাওয়া খাইতেছি।
- তাহেরা — (বাহুতে হাত বোলাতে-বোলাতে) আপনি আমাকে ব্যথা দিয়েছেন।
- খোদেজা — ব্যথা দিয়েছে ভালো করেছে। ও না এসে তোমাকে ধরলে কে বাঁচাত তোমাকে? মেয়ে আবার পানিতে ঝাঁপ দিতে চায়। শাবাশ মেয়ে।
- তাহেরা — আমাকে বাঁচানোর জন্য আপনাদের এত মাথাব্যথা কেন?
- হাশেম — (রেগে) চোখের সামনে মরতে দেখব নাকি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?
- তাহেরা — বুঝেছি। আপনারা কোরবানির গোস্ত খেতে পারেন, কিন্তু গরু জবাই চেয়ে দেখতে পারেন না। আপনারা ভেবেছেন সত্যি সত্যি আমি পানিতে ঝাঁপ দিতাম? নিজের জান দেওয়া কি অতই সোজা? আপনাদের বুদ্ধি নাই।

- খোদেজা – খোদা খোদা। এবার মেয়েটির মুখে অন্য কথা শুনি। বলে কিনা আমাদের বুদ্ধি নাই।
- হাশেম – আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না আম্মা। তিনি এখন আমাদের রাগাতে চান।
- তাহেরা – আপনাদের রাগিয়ে আমার লাভ কী, আপনারা ছেড়ে দিলে আমি যাব কোথায়? (সে বাহুতে হাত বোলাল আর একবার তির্যক দৃষ্টি হাশেমের দিকে তাকায়।)
- খোদেজা – (দুজনের দিকে তাকিয়ে) এসব আবার কী হৈয়ালি চলছে। হাশেম। তুই এখানে এত ঘুরঘুর করিস না তো। বাপের ঝোঁজখবর নেওয়া নাই, এ ঘরে জোঁকের মতো লেগে আছে। দ্যাখ তোর বাপের কী হয়েছে। বজরায় এত হুলস্থূল, তবু তার কোনো সাড়াশব্দ নাই।
- হাশেম – আম্মা, আমি যাচ্ছি কিন্তু আগে আমার একটা কথা শোনেন। পীরসাহেব পাশের ঘরে চুপচাপ বসে। এখন এবাদত করতে বসেননি; তিনি নতুন ফন্দি-কৌশল ভাবতে বসেছেন। কীভাবে তাঁকে নিয়ে যাবেন, কী চাল চাললে তিনি আর ফসকে যাবেন না, সেসব চিন্তা করছেন।
- খোদেজা – তোর মুখের কথাও যেন লাগামছাড়া হয়েছে। নিজের বিবিকে কীভাবে বশে আনবেন সে কথা নিয়ে চিন্তা করলে ফন্দি-কৌশল আঁটা হয় বুঝি।
- হাশেম – সেটা অন্য কথা! আমি বলতে চাই যে, যতই ফন্দি-কৌশল আঁটেন না কেন, আমি দেখব যাতে তাঁর কোনো ফন্দি-কৌশল না খাটে, কারণ, ওঁর যদি মত থাকে, তবে আমি তাঁকে বিয়ে করব। কথাটা আপনার সামনেই বললাম।
- খোদেজা – বিয়ে, বিয়ে করবি তাকে? এ কী কথা বললি? মেয়েটা তোর মাথা খেল নাকি। খোদা খোদা। আমি খাল কেটে ঘরে যেন কুমির এনেছি, হাশেম। তুই এখন থেকে এক্ষুনি বের হ? এ ঘরে আর আসতে পারবি না। পীরসাহেবকে যা বলবার হয় আমিই বলব। এক পীরসাহেবের বিবি, তাকে নাকি আমার ছেলে বিয়ে করবে। তা ছাড়া কী মেয়ে! যে মেয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে আত্মীয়স্বজন ছেড়ে পালাতে পারে সে কী করে ভালো মেয়ে? যা যা, এ কামরা থেকে যা হাশেম।
- হাশেম – আপনি বলছেন তিনি পীরসাহেবের বউ কিন্তু দুজন সাক্ষীর সামনে একটা কাগজে কী লেখাপড়া হয়েছে তার কোনোই দাম নাই। সামনে থাকলে আমি এখনই সেটা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলতাম। আমি পীরসাহেবকে গিয়ে বলছি সে কথা। আমার আর ভয়-ডর নাই। আর আমি কাউকে ভয় করি না।
- তাহেরা – আমার তাতে মত থাকবে সে কথা আপনাকে কে বললো?
- হাশেম – (হঠাৎ দমে গিয়ে) তাই, তাই। তবে আপনার কাছে সেকথা আমি বলি নাই।
- তাহেরা – না বললেও আপনি তাই ধরে নিয়েছেন।
- খোদেজা – (বিস্ময়ে) আমার ছেলে তোমাকে বিয়ে করতে চাইলে তুমি তাতে মত দেবে না।
- তাহেরা – সে কথাও আমি বলি নাই। তবে একজন বোঁকের মাথায় কেবল বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যই যদি কাউকে বিয়ে করতে চায়, তবে সে অত সহজেই মত দেবে কেন? বোঁক কেটে গেলে আপনার ছেলের মত হতে পারে, তিনি ভুল করছেন।
- খোদেজা – (আগের মতো বিস্ময়ে) আমাদের মধ্যে আমার ছেলেটাই তোমার জন্য এত করছে। আর তার কথায় তুমি মত দেবে না?
- তাহেরা – (একটু হেসে) হঠাৎ আপনি যেন চাইছেন আপনার ছেলের কথায় আমি মত দিই।
- খোদেজা – না না, সে কথা নয়। তোমাদের বিয়ে তো আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি তোমার অকৃতজ্ঞতা দেখে। সে জন্যই কথাটা বলছি।

- হাশেম — আন্মা, উনি কোনোই অকৃতজ্ঞতা দেখাচ্ছেন না। আপনি তাঁর কথা ঠিক বুঝতে পারছেন না। আমিও যা বলতে চাই তা তাঁকে বোঝানো আমার পক্ষে এখন সম্ভব নয়। সব কথা এক মুহূর্তে বোঝাও যায় না, বোঝানোও যায় না। তিনি যদি মনে করেন আমি ঝোঁকের মাথায় তাঁকে বিয়ে করতে চাইছি সেকথা সত্যও হতে পারে। তা সত্য কি মিথ্যা সে কথা জানতে হলে সময় নেবে। (তাহেরার দিকে তাকিয়ে) কিন্তু আপনাকে আমি কি সাহায্য করতে পারি না?
- তাহেরা — (নরম গলায়) আমাকে অকৃতজ্ঞ ভাববেন না। আপনারা সকলেই আমাকে সাহায্য করেছেন বলেই তো মনে সাহস পাচ্ছি। আপনার আন্মা থেকে থেকে আমাকে কথা শোনাচ্ছেন বটে কিন্তু তিনিও আমাকে সাহায্য করছেন। ইচ্ছা করলে তিনি কি আমাকে বের করে দিতে পারেন না?
- খোদেজা — (হৃদয়ে টান পড়া গলায়) হয়েছে হয়েছে এত চেষ্টার কথা শুনতে পারি না। হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠে বসে ডাকেন, হাশেম, ঐ যে তোর আন্মা তোকে ডাকছেন। তাঁর কথা আমরা সাবাই যেন ভুলেই গেছি। (কঠিন হয়ে) যা হাশেম। আর তোকে বলে রাখছি, ওসব সাহায্যটাহায্যের কথা আমি বুঝি না, বিয়ের কথা তো দূরে থাক। আর এ ঘরেও তোর কোনোই প্রয়োজন নেই। পীরসাহেবকে যা বলার আমিই বলব।
- হাশেম — আমার কথাটা খেলোভাবে নেবেন না আন্মা। আমি মন থেকেই কথাটা বলছি।
- তাহেরা — (একটু হুকুমের সুরে) যান আপনি পাশের ঘরে। দেখে আসুন আপনার আন্মা কেন ডাকছেন।
- খোদেজা — (তাহেরার দিকে চেয়ে) এখন তোমার হুকুমই সে বোধ হয় শুনবে।
- হাশেম — (হঠাৎ যেতে যেতে বিরক্তভাবে) যাচ্ছি, যাচ্ছি, আপনার কথা শুনাই যাচ্ছি। (পাশের ঘরে গিয়ে) আন্মা, আমাকে ডাকছিলেন?
- হাতেম আলি — (চমকে উঠে) হ্যাঁ বাবা, তোমাকে ডেকেছিলাম। বসো। তোমাদের কথাটা বলার সময় এসেছে। শুধু একটা রাত; একটা রাত কথাটা ঢেকে রেখে লাভ কী?
- হাশেম — (সবয়ে) আন্মা কী কথা বলবেন আপনি। কী কথা আর ঢেকে রেখে লাভ নাই?
- হাতেম আলি — অস্থির হয়ে না; অস্থির হয়ে লাভ নাই বাবা। দেখো না আমার মধ্যে সমস্ত অস্থিরতার শেষ হয়েছে। আমার মনে আর কোনো ভয়-আশঙ্কা নাই, কোনো অস্থিরতা নাই। শুধু বড় ক্লান্তবোধ করছি। (থেমে) না, এখন আর বলতে কোনো বাধা নাই। বাবা, তোমাদের কাছে একটা মিথ্যা কথা বলেছিলাম। আমার কোনো অসুখ হয় নাই, দাওয়াই করার জন্যও আমি শহরে আসি নাই। এসেছিলাম জমিদারি রক্ষা করতে।
- হাশেম — (বিস্ময়ে) জমিদারি রক্ষা করতে?
- হাতেম আলি — হ্যাঁ। কিন্তু রক্ষা করতে পারলাম না। কাল জমিদারি নিলামে উঠবে।
- হাশেম — কাল জমিদারি নিলামে উঠবে?
- হাতেম আলি — শহরে টাকার জোগাড় করতে এসেছিলাম। জোগাড় হলো না। জমিদারি বাঁচানোর আর কোনো পথ নাই। মধ্যে কেবলমাত্র একটি রাত, তারপর বুদবুদের মতো জমিদারি শূন্যে মিলিয়ে যাবে, আর সম্ভ্রমে সুস্থ দেহে আমাকে তাই চেয়ে চেয়ে দেখতে হবে, করার কিছুই থাকবে না। [স্তম্ভিতভাবে বাপের মুখের দিকে কতক্ষণ চেয়ে হাশেম ধীরপায়ে পাশের কামরায় যায়, গিয়ে বেঞ্চিতে বসে মেঝের দিকে চেয়ে মূর্তিবৎ বসে থাকে। খোদেজা উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তাহেরার চোখেও উৎকণ্ঠা আসে।]
- খোদেজা — তোর আন্মা কী বললেন? হাশেম! কথা বলিস না কেন?
- হাশেম — কাল আমাদের জমিদারি নিলামে উঠবে।

- খোদেজা — নিলামে উঠবে। কেন কেন? (স্তম্ভিত হাশেম এবার দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করে।)
- তাহেরা — (চমকে উঠে) আপনার ছেলে যে কাঁদছে!
- হাশেম — (সংযত হয়ে নাক ঝেড়ে) আমি কী আর জমিদারি যাচ্ছে বলে কাঁদছি নাকি। কান্না এলো আক্বার কথা ভেবে। তাঁর চোখে পানি নাই বটে, কিন্তু দুঃখে বুক নিশ্চয় ফেটে যাচ্ছে।
- হাতেম আলি — (উঠে এসে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে) আমার ছেলেটাকে ছাপাখানা করার পয়সা কখনো দিতে পারব না।
- হাশেম — (টেরিয়ে) আমি পয়সা চাই না। আমি পয়সাও চাই না, ছাপাখানাও চাই না। [হাতেম আলি আবার নিঃশব্দে ফিরে যান।]
- (উঠে পায়চারি করতে করতে আপন মনে) আমার কী আসে যায়। জমিদারি থাক বা না থাক আমার তাতে কিছু আসে যায় না। পড়াশোনা করেছি, এটা না হয় সেটা হবে, কিছু একটা করে খেতে পারবই। একটা স্বপ্ন ভেঙে গেলে আরেকটা স্বপ্ন গড়তে পারব। কিন্তু আক্বার কী হবে? এই বয়সে কী স্বপ্নই বা তিনি গড়তে পারেন? আশ্চর্য, আমরা সত্যিই ভেবেছিলাম তাঁর অসুখ হয়েছে। কিন্তু কী নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণাটি না তিনি ভোগ করেছেন যে কেবল তার মুখের দিকে তাকিয়েই সে কথা বিশ্বাস করেছি। যে মানসিক যন্ত্রণা দুদিনে শরীরকে ভেঙে দেয় সে মানসিক যন্ত্রণা কঠিন অসুখের চেয়ে কষ্টকর (খেমে মায়ের দিকে তাকিয়ে) আম্মা, কী হবে আক্বার? কী নিয়ে শেষ জীবনটা কাটাবেন?
- তাহেরা — কেন, আপনারা থাকবেন আপনি থাকবেন, আপনার আম্মা থাকবেন।
- হাশেম — জমিদারি! জমিদারি কী? কত জমিদারি এসেছে-গিয়েছে। আজ মাটি খুঁড়লেও কত কত বিশাল জমিদারির কোনো নিশানা পাওয়া যাবে না। তার তুলনায় আমাদের আর কীই বা ছিল। তাও না হয় আজ যাবে, কী আসে-যায় তাতে। আক্বাকে তাঁর এই শেষ বয়সে সে কথা কে বোঝাবে?
- [বহিপীর হঠাৎ উঠে আসেন, এসে খোলা দরজার সামনে দাঁড়ান]
- বহিপীর — বিবি। বহুত হইয়াছে, আর ফ্যাকড়া তুলিবেন না। দেখুন, তাঁহাদের কাহার মনে শান্তি নাই। সকলেই কেমন বেচাইন হইয়া পড়িয়াছেন। এই পারিবারিক দুশ্চিন্তার সময় তাঁহাদের ঘাড়ে চাপিয়া থাকিয়া তাঁহাদের আরও কষ্ট দেওয়া ঠিক হইবে না। আসুন, আমরা চলিয়া যাই। ও বিবি।
- [তাহেরা তাঁর কথায় কান না দিয়ে পায়চারি করতে থাকা হাশেমের দিকে চেয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে।]
- (অপেক্ষা করে) হুঁ। [তিনি স্বস্থানে আবার ফিরে যান, গিয়ে গুম হয়ে বসে থাকেন। পাশের ঘরে হাশেম পায়চারি বন্ধ করে হঠাৎ লম্বা হয়ে গুয়ে পড়ে বেকির ওপর। মাঝে মাঝে খোদেজা, হাশেম আলাপ করে। সে আওয়াজ শোনা যাবে না।]
- হকিকুল্লাহ্। ব্যাপারটা আমার কাছে ভালো ঠেকিতেছে না।
- হকিকুল্লাহ্ — জি।
- বহিপীর — (রেগে) কী বুঝিলে যে জি বলিলে? যাও তুমি এখন যাও। আমি জমিদার সাহেবের সঙ্গে একটু কথা বলি। (হকিকুল্লাহ্‌র প্রস্থান। বাইরে গিয়ে আবার হুঁকা ধরাবে।) জমিদার সাহেব।
- হাতেম আলি — আমাকে ডাকছেন পীরসাহেব?
- বহিপীর — বলি, এতটা ভাঙ্গিয়া পড়িলে চলিবে কেন? খোদার উপর আস্থা রাখিবেন।

- হাতেম আলি — জি, পীরসাহেব আস্থা রাখছি বৈকি।
- বহিপীর — তাঁহার ছেফাত যেমন অসাধারণ, তেমনি অসংখ্য। তাঁহার স্বরূপ আমাদের কল্পনাভীত কিন্তু তাঁহার ছেফাতের এক-আধটু পরিচয় আমরা সকলেই পাই। তাঁহার জন্য এবাদত করিতে হয় না। তাঁহার ছেফাতের উপর আস্থা রাখিবেন।
- হাতেম আলি — সব আস্থা আছে পীরসাহেব, সব আস্থা আছে। কিন্তু এই যে রাতটি ক্রমে ক্রমে গভীরতর হচ্ছে আর তার মুহূর্তগুলি একটার পর একটা নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছে, এ রাতটিকে তো এড়াতে পারব না, এ রাতকে কেউ ঠেকাতে পারবে না। পারবে কি পীরসাহেব?
- বহিপীর — খোদা কী না পারেন জমিদার সাহেব।
- হাতেম আলি — (বাস্তব করে) জমিদার সাহেব। ডাকটা এখন কেমন ঠাট্টার মতো শোনায়। জমিদারি নাই, তবু জমিদার।
- বহিপীর — আমি তা মনে করি না। জমিদার সাহেবকে জমিদার সাহেব ডাকিব না তো কী ডাকিব?
- হাতেম আলি — (একটু হেসে) সেটা আপনার মেহেরবানি পীরসাহেব।
- বহিপীর — না, মেহেরবানি নয়, স্বাষ্টি কথা। কারণ, আপনার জমিদারি যাইবে না।
- হাতেম আলি — (চমকে উঠে বিস্ময়ে) আপনার কথা বুঝলাম না পীরসাহেব।
- বহিপীর — বলিলাম। আপনার জমিদারি যাইবে না।
- হাতেম আলি — (বিস্ফারিত নেত্রে) পীরসাহেব, আমার মাথার অবস্থা এখন ঠিক নেই। আপনার কথা যেন ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি কী বলছেন যে আমার জমিদারি যাবে না?
- বহিপীর — ঠিক, আপনার জমিদারি যাইবে না।
- হাতেম আলি — (যেন অলৌকিক দৃশ্য দেখছেন) এ কী কথা বলছেন পীরসাহেব। সে কী করে সম্ভব?
- বহিপীর — সম্ভব, সম্ভব। দেখুন আপনি শহরে আসিয়াছিলেন টাকা কর্জ করিতে, কিন্তু আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই, আপনার চেষ্টা সফল হয় নাই। কিন্তু জমিদারিটা যাওয়া না-যাওয়া কেবল টাকার ওপরই নির্ভর করিতেছে। সে টাকা আমি আপনাকে কর্জ দিব।
- হাতেম আলি — পীরসাহেব!
- বহিপীর — (মাথা নেড়ে) অধীর হইবেন না। পহেলা আমার কথা শুনুন। হঠাৎ খেয়াল হইল আপনি যেমন আপনার দুঃখে মুষড়াইয়া পড়িয়া বাহ্যিক সব কিছুর প্রতি অন্ধ হইয়া মানসিক যাতনা ভোগ করিতেছেন, তখন পাশে বসিয়া আমিও আমার সমস্যায় লিপ্ত। তখন আমি ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিলাম দুঃখের কারণ যদি এক না হয়, তবে গভীর দুঃখগ্রস্ত দুটি লোকের মতো অপরিচিত আর কেহ নাই। পাশাপাশি বসিয়াও দুইজনের মধ্যে যেন আসমান-জমিনের প্রভেদ। আমার পাশে বসিয়াই আপনি গভীর বেদনা ভোগ করিতেছেন; যেহেতু জমিদারির সঙ্গে সঙ্গে আপনি আপনার মান-সম্মান খোরাকির ব্যবস্থা সব হারাইতে বসিয়াছেন। জমিদারিই হইল আপনার মূল। মূল কাটিয়া ফেলিলে বৃক্ষ দাঁড়াইতে পারে না; সব বৃক্ষিরা এবং আপনার পাশে বসিয়া থাকা সত্ত্বেও আপনার দুঃখ আমার মনে কোনো প্রকার দাগ কাটিতেছে না। উহার কারণ আমিও সমস্যাভাজক। বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়াছি। বিবির সঙ্গে দেখা হইবার পূর্বেই তিনি পালাইয়া গেলেন। আমি তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইলাম। ভাগ্যের কী খেলা আর খোদার কী মর্জি, তাঁহাকে এই বজরাতেই পাইলাম। তাঁহার সঙ্গে চাক্ষুষ দেখাও ঘটিল; বলিতে লজ্জা নাই, তাঁহাকে দেখার পর আমার এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হইল যে, তাঁহাকে আমি ফেলিয়া যাইতে পারি না। যে করিয়াই হোক, তাঁহাকে আমি সঙ্গে লইয়া যাইব। কিন্তু সমস্যা গুরুতর। তাঁহাকে

টলাইতে পারি না, তিনি আমার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য পানিতে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিতে পর্যন্ত প্রস্তুত। অবশ্য জোর-জুলুম করা যায়। জোর-জুলুম করিয়া পাগলা হাতিকেও বশ করা যায়, কিন্তু মানুষ তো আর জন্তু নয়। ভাবিলাম, অন্য কোনো পথ ধরিতে হইবে। আরও ভাবিলাম, আপনি ও আমি এক কামরায় বসিয়াও একাকী দুঃখ ভোগ করিতেছি, কেহ কাহার সাহায্যে লাগিতেছি না। ভাবিলাম, আমাদের দুইজনের সমস্যাকে জড়িত করিলে দুইজনের সমস্যারও হয়তো সমাধান হইতে পারে, না হইলেও অন্ততপক্ষে দুঃখে মিলিত হইয়া আমরা পরস্পরের দিলে কিছুটা শক্তি আনিতে পারি। আপনি আমার কথা বুঝিতেছেন তো?

হাতেম আলি — এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না, কিন্তু মন দিয়ে শুনিছি পীরসাহেব।

বহিপীর — আরও বলি, শুনুন। লোকেরা বলে, খোদা আমার দেলে বৃহানি শক্তি দিয়েছেন। কিন্তু সে কথা আমি জানি না। আমি উদার লোক। বহুব্রূপীকে যেমন বহুব্রূপী হইবার জন্য সঙ্গ সাজিতে হয়, তেমনি পীর হইতে হইলে তাকে পীরের সঙ্গ ধরিতে হইবে—এ কথা আমি মানি না। কিন্তু বৃহানি শক্তি থাকুক বা না থাকুক, আমি টক করিয়া মানুষের মনের কথা বুঝিতে পারি। শুধু একনজর দেখিলেও বিবিকে আমার চিনিতে দেবি হয় নাই। স্নেহবিবর্জিতভাবে সৎমায়ের ঘরে মানুষ-হওয়া আমার মাতৃহারা বিবিটি জীবনে কখনো স্নেহ-মমতা পান নাই। দায়িত্বের খাতিরে তাঁহার বাপজান তাঁহার ভরণ-পোষণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু স্নেহ-মমতা দেন নাই। দায়িত্বের খাতিরে দায়িত্ব পালন করা আর স্নেহ-মমতার খাতিরে দায়িত্ব পালন করার মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক। কাজেই যেখানেই আমার বিবি একটু স্নেহ-মমতার আভাস পাইবেন, সেখানেই তাঁহার সমস্ত দিল হইতে কৃতজ্ঞতা উথলাইয়া উঠিবে। এ কৃতজ্ঞতার তেজ নেশার মতো। ইহার ঘোরে মানুষ অনেক কিছুই করিতে পারে। কাজেই আপনাদের নিকট তিনি যে সামান্য স্নেহ-মমতার আভাস পাইয়াছেন, তাহারই প্রতিদানস্বরূপ তাঁহাকে যাহাই বলিবেন তিনি তাহাই করিবেন।

হাতেম আলি — পীরসাহেব, মেহেরবানি করে আরও খুলে বলুন।

বহিপীর — আসল কথা বলিবার আগে আরেকটা কথা বলিয়া লই। আপনি ভাবিতে পারেন, আমি পীর মানুষ, আমি অত টাকা কোথায় পাইব যাহার দ্বারা আপনার জমিদারি উদ্ধার করা যাইতে পারে। কিন্তু খোদা আমাকে যথেষ্ট অর্থ দিরাছেন। তা ছাড়া খোদারই মর্জি, তিনি আমাকে অনেক ধনী মুরিদও দিয়াছেন, যাহাদের কাছে হাত পাতিলেই যাহা চাহিব তাহাই তাঁহারা দিবেন। মাটিকে সোনা করিবার কেরামতি আমার জানা নাই, কিন্তু একবার মুখ খুলিয়া চাহিলেই আমার মুরিদগণ ভিটাবাড়ি বন্ধক দিয়া হইলেও আমার অনুরোধ রক্ষা করিবেন। কিন্তু আমি কখনো কাহার কাছে এমন অনুরোধ জানাই নাই। আমার অর্থের কী প্রয়োজন। যাহা আমার আছে তাহাও আমি বিলাইয়া দিতে পারি। এক এক সময় ভাবি, সব ছাড়িয়া ফেলিয়া সত্যিই চলিয়া যাই যেদিকে চোখ যায়, গুহা-গহবরে, অরণ্য-পর্বতে ও ইরান-তুরান-কাবলিস্থানে—যেখানেই নিরিবিলি একাকী খোদার এবাদত করা যায়। কিন্তু উহা স্বপ্ন, পীরের স্বপ্ন থাকে। আসলে আমি ইহাই ভাবি যে, সমস্ত ত্যাগ করিলে এবাদত হয় না, কারণ সমস্ত ত্যাগ করিলে মানুষ আর মানুষ থাকে না, অমানুষে পরিণত হয়। শূন্যতার মধ্যে শূন্যতাই সম্ভব; যেখানে বৃহ-এর মুক্তি মিলে না। তাহা হইলে খোদা কেবল আসমানই সৃষ্টি করিতেন, জমিন করিতেন না। অবশ্য অর্থ-বশ-মানের লোভ ত্যাগ করিতেই হয়, কিন্তু জীবনে সামান্য ঘনিষ্ঠ স্নেহ-মমতার সিঙ্কল না থাকিলে কোনো এবাদতই সম্ভব নয়। পানির অভাবে বৃক্ষ যেমন শুকাইয়া মরিয়া যায়, তেমনি সামান্য স্নেহ না থাকিলে বৃহও মরিয়া যায়। তখন এক ঢোক পানি না পাইলে ঐশী প্রেমের সাধনা করা যায় না। সেই কারণেই আমি আমার বিবিকে চাই। আপনি অবশ্য বলিতে পারেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাই না কেন, যাইতাম, যদি না তাঁহার মধ্যে একটি অসাধারণ নারীর পরিচয় পাইতাম।

পালাইয়া যাওয়া কাপুরুষের লক্ষণ, পালাইয়া যাওয়াটা অতি সহজও। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তিনি পালাইয়া অতিশয় বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন, সহজ এই কাজটা কেহ কোনো দিন করিতে পারে না বলিয়াই তাহা করিয়া তিনি অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাকে আমি কী করিয়া ফেলিয়া যাই? আমি এখনো জানি যে, জীবনে কখনো স্নেহ-মমতা না পাওয়ার জন্য তিনি এই কথা সহজে বিশ্বাস করিতে চান না যে, তাহা সত্যই পাওয়া যায়। সেই জন্যই তিনি আমাকে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু একবার কোনো প্রকারে আমি যদি তাঁহাকে আমার স্নেহ-মমতার পরিচয় দিতে পারি, তিনি আমার নিকট হইতে আর পালাইতে চাহিবেন না। সেই পরিচয় দিবার একটা সুযোগই আমি চাই, এবং সেই কারণেই আপনার সমস্যা আর আমার সমস্যাকে মিলিত করিতে উদ্ভাবি। এইবার আমার প্রস্তাবিত কথা আপনাকে বলি, শুনিতেন জমিদার সাহেব?

হাতেম আলি — জি পীরসাহেব, শুনছি, মন দিয়ে শুনছি।

বহিপীর — প্রশ্ন করি বলিয়া তাহা মনে করিবেন না। সারা জীবন বাঁধা-ধরা কথা বলিয়াছি, লোকেরা শুনিয়াছে কী শুনে নাই, তাহা লইয়া বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাই নাই। কিন্তু অকস্মাৎ কখনো মৌলিক কথা বলিতে থাকিলে ভয় হয় উহা বুঝি কেহ শুনিল না। দুনিয়ায় হাজার হাজার লোক লক্ষ লক্ষ ফুলগাছ রোপণ করে, আপনি আপনার আশ্তিনার একটু গাঁদা ফুলের গাছ রোপণ করিলেও তাহা সকলকে ডাকিয়া দেখাইতে আপনার ইচ্ছা হয়। যা হোক আমি বলিয়াছি, আপনাকে আমি টাকা কর্জ দিব। এই শহরেই আমার জন্য অনেক ধনী মুরিদ আছেন। তাঁহাদের কাছে চাহিলেই পাইব। সে টাকা দিয়া আপনি আপনার জমিদারি বাঁচাইতে পারিবেন, উহা আর নিলামে উঠিবে না। তবে একটা শর্তে আপনাকে টাকা কর্জ দিব। তাহেরা বিবিকে আমার সঙ্গে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

হাতেম আলি — (বিস্ময়ে) এই শর্তে যে আপনার বিবিকে আপনার সঙ্গে ফিরে যেতে হবে?

বহিপীর — (জোর দিয়ে) জি, আপনাকে আমি টাকা কর্জ দিব এই শর্তে যে আমার বিবি আমার সঙ্গে ফিরিয়া যাইবেন।

হাতেম আলি — (ইতস্তত করে) আমাকে মাফ করবেন পীরসাহেব, কিন্তু আমি যেন কিছুই আজ বুঝতে পারছি না। আমার জমিদারি ধাকা না-ধাকার সঙ্গে তাঁর যাওয়া না-যাওয়ার কী সম্পর্ক?

বহিপীর — বেয়াদবি মাফ করিবেন, কিন্তু বিপদে পড়িয়া মানসিক দুঃখকষ্টের ফলে আপনার মস্তক যেন ঘোলাটে হইয়া আছে। তাই আপনার বুদ্ধিতে সময় নিভেছে। যান, সময় বেশি নাই। আপনি ভিতরে গিয়া সকলকে, বিশেষ করিয়া আমার বিবি সাহেবকে কথাটা বলুন। হকিকুল্লাহ্। (হকিকুল্লাহ্ এলে) পিঠটা একটু ভালো করিয়া টিপিয়া দাও। কেমন ব্যথা করিতেছে। (টিপতে শুধু করলে থেকে থেকে বহিপীর আনন্দধ্বনি করবেন) আর দেরি করিবেন না, জমিদার সাহেব, যান ভিতরে গিয়া বলুন। (হাতেম আলি আঙুলে উঠে পাশের ঘরে যান। মুখ ভারাক্রান্ত, হাশেম উঠে বসে তাঁর দিকে তাকায়, খোদেজাও।)

হাতেম আলি — (বেষ্টিতে বসে; তাহেরার দিকে তাকিয়ে) মনের চিন্তায় ছিলাম, ব্যক্তিগতভাবে আপনার খোঁজখবর নিতে পারি নাই। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন আমার চিন্তার কারণ। আমাদের এত পুরনো জমিদারি ওঠে ওঠে। আগামীকালই তার নিলাম ওঠার তারিখ।

তাহেরা — (আঙুলে) জি, শুনেছি।

হাতেম আলি — শহরেও টাকার ব্যবস্থা হলো না; যদিও অনেক আশা ছিল যে হবে। বন্ধু আনোয়ার উদ্দিন সাহায্য করতে পারলেন না। আমি চোখে আঁধার দেখছিলাম। এমন সময় পীরসাহেব আমাকে টাকা কর্জ দিতে রাজি হলেন। আমি তাঁর কাছে টাকা চাই নাই, তিনিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দিতে চেয়েছেন।

- হাশেম — পীরসাহেব টাকা দিতে চেয়েছেন।
- খোদেজা — খোদা, খোদা। সবই খোদার রহমত।
- হাতেম আলি — কিন্তু একটা শর্ত আছে। পীরসাহেব আমাদের টাকা কর্ত্ত দেবেন এই শর্তে যে আপনি তাঁর সঙ্গে ফিরে যাবেন। কিন্তু এই শর্তের আমি কোনোই অর্থ বুঝি না। আপনার সঙ্গে আমার জমিদারির কী সম্পর্ক? তা ছাড়া আপনি এখানে মেহেরবানি করে আশ্রয় নিয়েছেন বটে, কিন্তু আপনি কী করবেন কোথায় যাবেন তার সঙ্গে এ জমিদারির কী সম্বন্ধ? কাজেই এটি কেমনতর শর্ত আমি বুঝতে পারছি না। পীরসাহেব না বলে অন্য কেউ এমন কথা বললে মনে করতাম ঠাট্টা করছেন।

[কয়েক মুহূর্তব্যাপী স্তব্ধতা]

- তাহেরা — না, পীরসাহেব ঠাট্টা করছেন না। পীরসাহেব বুদ্ধিমান লোক। কেবল তিনি এবার অন্য এক ধরনের চাল চালছেন।
- হাশেম — (ফেটে পড়ে) চাল, কী চাল?
- তাহেরা — বুঝতে পারছেন না?

[আবার স্তব্ধতা]

- হাশেম — আচ্ছা, বুঝেছি কিস্তিমাৎ করা চাল। যে কথা আপনিও বোঝেননি আমি বুঝিনি, সে কথা পীরসাহেব ঠিক অনুমান করেছেন। তিনি ঠিক বুঝেছেন যে তাঁর বিবি ঘর ছেড়ে পালাতে পারেন। যদিও জানেন না কোথায় যাবেন, কোথায় থাকবেন, এমনকি তিনি পানিতে পড়ে আত্মহত্যা করতে পর্যন্ত প্রস্তুত, কিন্তু একটি নির্দোষ পরিবারকে তিনি ধ্বংস হতে দিতে পারেন না, যদি সেই পরিবারকে রক্ষা করার একমাত্র চাবি তাঁরই হাতে তুলে দেওয়া যায়। কেবল তাঁরই জন্য একটি পরিবারকে তিনি উচ্ছেদ যেতে দিতে পারেন না।
- হাতেম আলি — এ কী আবার নতুন সমস্যা। নিজের অস্তিত্ব বাঁচানোর জন্য একটি লোক আরও কত রকমের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে।
- হাশেম — (তাহেরার দিকে তাকিয়ে) আমাদের বাঁচানোর দায়িত্ব এখন আপনার। বড় কঠিন দায়িত্ব; এ দায়িত্ব রক্ষা করতে হলে যেখান থেকে প্রাণপণে ছুটে পালিয়েছেন, সেখানে এবার আপনাকে ফিরে যেতে হবে।
- খোদেজা — খোদা, খোদা। কী দায়িত্ব, কী শর্ত?
- হাশেম — (অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে) আর বুঝে কী হবে আচ্ছা। তবে আপনার ভয়ের কোনো কারণ নাই। এবার তিনি ফিরে যাবেন পীরসাহেবের খেদমত করার জন্য, পানিতে আর ঝাঁপ দিতে চাইবেন না, আপনার একমাত্র ছেলেরও মাথা খরাপ করবেন না। আপনি না চাইছিলেন এবার তাই হবে।
- খোদেজা — হাশেম, হাশেম, অত অস্থির হস্ না, আমার বুক ধড়ফড় করছে।
- হাশেম — (মায়ের দিকে দাঁড়িয়ে) আপনি বুঝতে পারছেন না যে পীরসাহেব আমার মুখও বন্ধ করেছেন। আমি তাঁকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। কারও সমর্থন নাই, তবু ভাবছিলাম কিছু একটা করবই। কিন্তু এবার আমার মুখ বন্ধ হলো। আমিই একমাত্র তাঁর দলে ছিলাম, এবার তাঁর পক্ষ হয়ে আমার বলার কিছু থাকল না। আমি কী করে এবার বলি আপনি পালান, যাবেন না পীরসাহেবের সঙ্গে, মানবেন না তাঁর শর্ত, যাক আমার বাপের জমিদারি ধ্বংস হয়ে। আমার বাপের মনে যে সামান্য আশার সঞ্চার হয়েছে, এত গভীর নিরাশার মধ্যে সামান্য একটু যে— আলো দেখা দিয়েছে, সে আলোকে ধূলিসাৎ করে আপনি পীরসাহেবের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দিন। উনি নিশ্চয়ই তা করতে পারেন, কিন্তু আমি তাঁকে আর সে কথা বলতে পারি না।

- খোদেজা — হাশেম, হাশেম, তুই একটু চুপ করে বস, হাশেম!
- হাশেম — (তাহেরার সামনে দাঁড়িয়ে) কী করতে চান আপনি? শুনলেন তো শর্ত, জানেন তো কীভাবে বাঁচবে আমাদের জমিদারি।
- তাহেরা — কী আর করব (একটু হেসে) যে লোক বৃদ্ধ হয়েও এত বুদ্ধিমান তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।
- খোদেজা — এই যে মেয়েটি হাসছে। তার মনে চিন্তা নাই, আর আমার ছেলেটি পাগলের মতো লাফালাফি চেষ্টামেটি করছে।
- হাশেম — (সে কথায় কান না দিয়ে তাহেরার দিকে চেয়ে) রহস্য করবেন না, পরিষ্কার করে বলুন, কী করতে চান?
- তাহেরা — (গম্ভীর হয়ে) বলছি, বলছি। (যেন ভাবে, তারপর হঠাৎ ভেঙে পড়ে কাঁদতে শুরু করে। আবার কয়েক মুহূর্তব্যাপী নীরবতা।
- হাশেম — আঝা! দেখুন উনি কাঁদছেন।
- তাহেরা — (সংযত হয়ে) না না এমনি কান্না এলো। আমি বলছি, এত চেষ্টামেটি করলে কী করে বলি।
- খোদেজা — হাশেম তুই চুপ করে থাক। এখানে তোর আঝা আছেন, তিনি সব বোঝেন। কিছু বলতে হলে তিনিই বলবেন। (হঠাৎ বেঞ্চিতে বসে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকে।)
- তাহেরা — পীরসাহেব যা চান তাই হবে। তাঁকে বলুন, আপনাকে টাকা দিলে তাঁর সঙ্গে আমি ফিরে যাবো। কিন্তু আগে তাঁকে টাকা দিতে হবে, তারপর আমি যাব।
- হাতেম আলি — হাশেম কী করব? (হাশেম নীরব থাকে)
- খোদেজা — হাশেমকে কেন জিজ্ঞাসা করছেন? ও বলার কে?
- হাতেম আলি — একজন চেষ্টামেটি করে আর একজন কাঁদে। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। নিজেই যেন কসাইর মতো মনে হচ্ছে। (হঠাৎ আত্মসংবরণ হারিয়ে) আমি আর কত পারি, বাবা। তোমরা যদি বুঝতে এত দিন কী দোজখ গেছে আমার ওপর দিয়ে, কী যাতনায় ভুগেছি একা একা, জমিদারি হারানো কী সহজ কথা।
- তাহেরা — আপনি অমন করবেন না। পীরসাহেবকে গিয়ে বলুন, আমি শর্ত মেনে নিতে রাজি আছি। আর ভাববেন না এ বিষয়ে।
- হাশেম — (আপন মনে) আশ্চর্য, শুধু কতগুলো টাকার ওপর এতগুলো জীবন নির্ভর করছে। হয় এটি ধ্বংস হবে, না হয় ওটি ধ্বংস হবে। আর, আর আমার কিছু বলার নেই। কিছুক্ষণ আগেও ছিল, এখন আর নাই।
- খোদেজা — আমিই বলি। আমি অত প্যাঁচের ধার ধারি না। পীরসাহেব নেক মানুষ, তিনি ভালোই করতে চান। আমাদেরও, তাঁর বিবিরও। জমিদারি গেলে আমাদের সব যাবে, কিন্তু সে ফিরে গেলে তার কিছু ক্ষতি হবে না। বরঞ্চ সে মান, যশ, সুখ, সম্পত্তি সব পাবে। তিনি যদি না বাঁচান তবে কে তাঁকে বাঁচাবে? তিনি তাঁর জন্য যা করেছেন, তা কেউ কারও জন্য করেন না। মেয়েটা বোকা, তাই বোঝে না। দুঃখ হলো এই যে, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যেন বুদ্ধি হারিয়েছি। এতে এত ভাববার কী আছে?
- হাশেম — (ব্যঙ্গের সুরে) না না, ভাববার কী আছে, আমাদের ভাববার কিছুই নাই।

[এ কামরায় এরপর সবাই ভাবে]

- বহিপীর — ঐ ঘরে একবার যে যায় সে আর সহজে ফিরতে পার না। কী হইল জমিদার সাহেবের? (থেমে) হকিকুল্লাহ, হয়তো তোমাকে একটু বাহির হইতে হইবে। রাতেই তাহাদের বলিয়া রাখা সমীচীন হইবে, সময় তো বেশি নাই।
- হকিকুল্লাহ — জি হুজুর!
- বহিপীর — পাশের ঘরে কোনো আওয়াজ নাই। সকলে মিলিয়া কী করিতেছে? গোপনে-গোপনে শলাপরামর্শ আঁটিতেছে না তো? কী মতলব তাহাদের?
- হকিকুল্লাহ — হুজুর, কী করে বলব কার মনে কী?
- বহিপীর — (রেগে) তুমি তো কখনোই বলিতে পারো না। অপরের মাথায় সুড়ঙ্গ কাটিয়া প্রবেশ না করিলে যেন মনের কথা জানা যায় না। তওবা, তওবা পিট জোরে টিপ।
- তাহেরা — (জেগে উঠে) সত্যিই আর ভাববার কিছু নাই। যান, পীরসাহেবকে গিয়ে বলুন, আমি রাজি আছি।
- হাতেম আলি — (খোদেজার দিকে তাকিয়ে) আপনি কী বলেন?
- খোদেজা — আমি তো বলেছি। মেয়েটি বুঝতে পারছে না যে পীরসাহেব তার ভালোর জন্যই এত সব করছেন। যে রাস্তার মেয়েলোকের মতো ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায় তার ভালোর জন্যই তিনি যে এতটা করেছেন, তা বড় জোর-কপালের কথা। অন্য কেউ হলে এমন মেয়ের জন্য এক পাও নড়ত না। তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে ভালোভাবে খেয়ে-পরে সে সুখে-শান্তিতেই থাকবে। তা ছাড়া, পীরের ছায়ায় বাস করার সৌভাগ্য ক'জনের হয়? পীরসাহেব একটা চাল যদি চলেই থাকেন তবে সেটা সকলের ভালোর জন্যই চলেছেন। নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি এই তো বুঝি।
- তাহেরা — জমিদার সাহেব, তিনি ঠিকই বলছেন। যান, ভাববেন না।
- হাশেম — (চিৎকার করে) আব্বা!
- হাতেম আলি — (চমকে) কী বাবা?
- হাশেম — (সুর বদলে) না, কিছু না। তিনি যা বলছেন তাই করুন।
- বহিপীর — (দরজার দিকে তাকিয়ে) কী হইল তাঁহার? জমিদার সাহেব কিছু আসিয়া বলিবেন তো! (খাট্টা মেজাজে) বহু হইয়াছে, হকিকুল্লাহ, আর নয়। বলিলাম টিপিতে, তুমি কিনা আমার শরীরটা ভর্তা বানাইয়া দিলে। ময়দা নাকি আমার শরীরটা?
- হাতেম আলি — (তাহেরার দিকে তাকিয়ে লজ্জিতভাবে) আর কিছু বলবেন না?
- তাহেরা — (মাথা নাড়ে)
- খোদেজা — তার কথা যে বলেছে। আপনি যান, গিয়ে বলুন যে রাজি আছে।
- হাতেম আলি — (হাশেমের দিকে তাকিয়ে) কী বাবা, উঠতে পারছি না কেন? চক্ষুলজ্জা নাকি?
- হাশেম — লজ্জা করে কী হবে, আব্বা? তা ছাড়া করার যখন আর কিছুই নাই তখন চক্ষুলজ্জা অর্থহীন। আমরা যদি দোষী হয়েই থাকি, তবে সে দোষ চক্ষুলজ্জায় ঢাকবে না, বরঞ্চ তাতে দোষটা খুঁচিয়ে বের করে দেখানো হবে।
- হাতেম আলি — (দৃঢ়চিত্তে উঠে পড়ে) আচ্ছা যাই। কিন্তু বলুন, আপনি অসুখী হবেন না তো?
- তাহেরা — না, অসুখী কেন হবে?
- হাশেম — (রেগে অসংযত হয়ে) আমাদের মুখে চুনকালি দিয়েছেন। সেটা হজম করেছে আবার মিথ্যা কথা বলে সে চুনকালি রগড়াচ্ছেন কেন?

- খোদেজা — হাশেম!
- হাশেম — চোঁচান, চোঁচান। এবার জমিদারি তো ফিরে পেয়েছি, আসুন সবাই চোঁচাই। [হাতেম আলি উঠে পাশের ঘরে যান। দরজা আধা-খুলে হাশেম দাঁড়িয়ে থাকে।]
- বহিপীর — কী খবর জমিদার সাহেব?
- হাতেম আলি — তিনি যাবেন।
- বহিপীর — শোকর আলহামদুলিল্লাহ্। হকিকুল্লাহ্, হকিকুল্লাহ্!
- হাতেম আলি — (বাধা দিয়ে) কিন্তু একটা কথা আছে। তিনি রাজি আছেন আমি রাজি নই। আমি এভাবে টাকা নিতে পারব না। যায় যাক জমিদারি।
- বহিপীর — ভবিয়া কথা বলিতেছেন কি?
- হাতেম আলি — অনেক তো ভেবেছি এ কদিন ভাবতে ভাবতে শরীরে আর কিছু নাই। কিন্তু হঠাৎ সব ভয় ভাবনা কেটে গেছে, আরও মনে হচ্ছে, নতুন এক জীবনের স্বাদ পেয়েছি।
- হাশেম — (চোঁচিয়ে) আব্বা! (এগিয়ে আসে)
- বহিপীর — ভালো ভালো। যেমন বোঝেন। আমার আর কিছু বলিবার নাই।
- খোদেজা — (লাফিয়ে দরজার কাছে এসে) কী বললেন পীরসাহেবকে?
- হাতেম আলি — (হেসে) বললাম, তিনি রাজি আছেন কিন্তু এভাবে আমি টাকা চাই না, যাক জমিদারি। [খোদেজা থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।]
- বহিপীর — (ঘন ঘন মাথা নেড়ে) হুঁ, বেশ বলিয়াছেন, উত্তম কথা বলিয়াছেন। হুঁ। উত্তম কথা, অতি উত্তম কথা।
- খোদেজা — (চোঁচিয়ে) পীরসাহেব, আমাদের ওপর রাগ করবেন না; আমাদের বদ্দেয়া দেবেন না।
- বহিপীর — (হঠাৎ রেগে উঠে) আমাকে আপনারা কী ভাবিয়াছেন, আমি পীর হইয়াছি বলিয়া কি মনুষ্য নই? ভাবিতেছেন, আপনারাই সব একেক জন দয়ার সাগর আর আমি একটি হৃদয়হীন পশু, বেদরদ বেশরম জল্লাদ? জমিদার সাহেব বিনা শর্তে আপনি টাকা পাইবেন। ইহা দান নয়, ইহা পীরি বদন্যতাও নয়। আপনাকে ইহা লইতেই হইবে। আমার বিশেষ অনুরোধ।
- হাতেম আলি — পীরসাহেব? কী বলছেন আপনি?
- খোদেজা — খোদা, খোদা!
- বহিপীর — অবাক হইবেন না। অবাক হইবার কিছু নাই। তবে একটা কথা। আমার বিবি সম্বন্ধে যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। সে বিষয়ে আমার কোনো ভুল হয় নাই। কিন্তু জমিদার সাহেবের ব্যাপারে আমি নেহাতই ভুল করিয়াছি। অতি আশ্চর্য, সে বিষয়ে সত্যিই নিঃসন্দেহ ছিলাম। এত নিঃসন্দেহ ছিলাম যে, তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তাহা এক মুহূর্তের জন্য খেয়াল হয় নাই। আমাকে ভুল মানিতেই হইবে। আর এ কথাও মানিতে হইবে যে, কোনো মানুষ হঠাৎ আশাতীত কাজ করিয়া বসিতে পারে।
- হাতেম আলি — পীরসাহেব, এমন কথা বলবেন না।
- বহিপীর — না বলিয়া উপায় কী, কিন্তু ইহা প্রলাপ বকার মতো। চিন্তা করিবেন না, টাকা আপনি পাইবেনই।
- হাশেম — (হঠাৎ ধৈর্যহারা হয়ে) না, পীরসাহেব, টাকা আমাদের চাই না।
- খোদেজা — হাশেম!
- হাশেম — (হাতেম আলির দিকে চেয়ে) আব্বা বলে দিন পীরসাহেবকে, বলে দিন যে সত্যিই আমরা টাকা চাই না।

- খোদেজা — হাশেম, হাশেম।
- বহিপীর — (অবাক হয়ে) এখন বাবা কী? আমার আর কোনো শর্ত নাই। সকলে মিলিয়া আমাকে অমানুষে পরিণত করিয়াছেন। জমিদার সাহেবের উপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা ছিল যে তিনি আমার দলে থাকিবেনই, কিন্তু তিনিও আমাকে ঠকাইলেন। আর কিছু না থাকিলেও আমার জোব্বার সম্মান তো দিবেন? না, ইহা আপনাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। মনে করিবেন, ইহা পরাজিত শত্রুর শেষ দাবি। এ দাবি কবুল করিতেই হয়।
- তাহেরা — (উচ্চ বীর কণ্ঠে) দেখুন, আমি একবার যে কথা বলেছি সে কথার ব্যতিক্রম হবে না। আমি যাব।
- হাশেম — (চোঁচিয়ে) কী বলেছেন আপনি?
- খোদেজা — হাশেম!
- তাহেরা — (দৃঢ় কণ্ঠে) আমি যাবই!
- হাশেম — (পূর্ববৎ) বুঝতে পারছি, সবার বদান্যতার পরীক্ষা চলছে, বদান্যতার জোরে জান যায় মানুষের; তার নেশায় অন্ধ হয়।, বুদ্ধি-বিবেচনার শক্তিও হারায়। আপনি ভুল করবেন না। আপনার সত্য পণ এটা নয়। না, আপনাকে নেশায় ধরেছে। আপনি জানেন না যে, এঁরা আপনার জীবন নিয়ে খেলা করছেন। আপনি যেন দাবার গুটি, জীবন নিয়ে খেলা করছেন, বুঝতে পারছেন না সে কথা? না, না, আপনাকে আমি বাঁচাবই। (দ্রুতপায়ে তাহেরার পাশে এসে) চলুন আমার সঙ্গে, চলুন আমরা পালাই; এ বদান্যতা হঠাৎ আপনার কাছে মধুর মতো ঠেকেছে; বুঝতে পারছেন না যে, এ বিষ! (হাত ধরে বাইরে দরজার দিকে নিয়ে যেতে যেতে) আপনাকে নিয়ে যাবই। বলে দিলাম, আপনাকে বাঁচাব। আপনাকে বাঁচাবার সময় আমার হয়েছে। এখন আপনাকে আর ছেড়ে দিতে পারি না।
- তাহেরা — (বিস্ময়ে) একি কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?
- হাশেম — কথা বলবেন না। (বেরিয়ে যায়)
- খোদেজা — (হাতেম আলিকে) কী করছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। থামান তাদের? থামান আমার ছেলেকে?
- হাতেম আলি — হাশেম! (দ্রুতগতিতে উঠে দরজার দিকে রওনা হতেই বহিপীর তার হাত ধরে ফেলেন, আর ইশারায় খোদেজাকে ধৈর্য ধরতে বলেন।)
- খোদেজা — পীরসাহেব।
- বহিপীর — ধৈর্য ধরুন, ধৈর্য ধরুন।
[ততক্ষণে হাশেম তাহেরাকে হাত ধরে তীরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তাহেরার চলাটা ইচ্ছাকৃত না হলেও সে বিশেষ বাধা দেয় না। কেবল বলতে থাকে, কোথায় যাব? কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে? এ ঘরে বহিপীর ব্যতীত আর সবাই বিমূঢ় হয়ে থাকে।]
- বহিপীর — (দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে) এতক্ষণে ঝড় খামিল। তাহারা গিয়াছে, যাক। তা ছাড়া তো আগুনে ঝাপাইয়া পড়িতে যাইতেছে না। তাহারা তাহাদের নতুন জীবনের পথে যাইতেছে। আমরা কী করিয়া তাহাদের ঠেকাই। আজ না হয় কাল, যাইবেই।
- খোদেজা — (অধীর কণ্ঠে) পীরসাহেব! কী হবে আমাদের?
- বহিপীর — (হেসে) তওবা তওবা। এত বিচলিত হইবার কী আছে? আমরা সকলে তো রহিলাম। আমরা থাকিব; আপনার জামিদারিও থাকিবে; আমরা আমাদের পুরাতন দুনিয়ার মধ্যে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাকি দিন কাটাইয়া দিব। চিন্তার কী কারণ?
- খোদেজা — (হঠাৎ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) পীরসাহেব!

বহির্পীর – (দেদার হেসে) আপনি এইবার আমাকে বদ্দোয়া দিতেছেন। কিন্তু পীরের ঐ এক সুবিধা। কোন বদ্দোয়া পীরের গায়ে লাগে না। আসুন জমিদার সাহেব, আমরা আপনার জমিদারি রক্ষার ব্যবস্থা করি। হকিকুন্নাহ!

[যবনিকা]

শব্দার্থ ও টীকা

বহির্পীর	–	পির কথা বলত 'বহি' বা বইয়ের ভাষায়। তাই তার নাম হয়েছে বহির্পির। [বর্তমান পাঠে নাটকের নাম হিসেবে লেখকের ব্যবহৃত 'বহির্পীর' বানান অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে।]
বজরা	–	ভ্রমণ-উপযোগী বিলাসবহুল কাঠের নৌকাবিশেষ।
মুরিদ	–	অনুসারী। পিরের অনুসারী।
লেবাস	–	পোশাক।
জোয়ান	–	যুবক। তরুণ।
সওয়াল	–	প্রশ্ন।
জবান	–	ভাষা। মুখের কথা।
চঙ	–	রীতি। এখানে বিভিন্ন রীতির ভাষা চালু থাকার বিষয়ে বোঝানো হয়েছে।
গুচুতন্ত	–	গোপন রহস্য।
বরং	–	বরং।
ক্ষিপ্ত	–	দ্রুত।
সটান	–	সোজাসুজি। টানটান হয়ে।
অন্তঃসারশূন্য	–	কাঁপা। সারবস্তু নেই এমন।
সংবিৎ	–	হুঁশ। এখানে জ্ঞান ফিরে পাওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
খান্দানি	–	খানদান বা জাত ভালো যার। অভিজাত।
আলখান্না	–	ঢিলেঢালা জামাবিশেষ।
মকদ্দমা	–	মামলা।
দাওয়াই	–	ওষুধ।
মূর্তিবৎ	–	মূর্তির মতো। স্থির।
সঙ	–	ভাঁড়। সাধারণভাবে সার্কাসে বিচিত্র ধরনের পোশাক পরে দর্শকের মনোরঞ্জন করে এমন ব্যক্তি।
স্বতঃপ্রবৃত্ত	–	স্বেচ্ছায়। নিজের ইচ্ছায়।
সমীচীন	–	যৌক্তিক। যথাযথ।
বিমূঢ়	–	বিহ্বল। বিম্মিত হওয়া।
তরিকাবিহীন	–	আইন ও নীতি বহির্ভূত।
কুহানি শক্তি	–	কুহের শক্তি। আত্মিক ক্ষমতা।